দৃষ্টিভংগি ও জীবনদর্শন

মেজর (অবঃ) এম, এ জলিল

দৃষ্টিভংগি
ও
জীবনদর্শন

মেজর (অবঃ) এম, এ জলিল

www.pathagar.com

প্রকাশক ঃ
ইতিহাস পরিষদের পক্ষে
এফ, রহমান
ছোট বলিমেহের
সাভার, ঢাকা

ইতিহাস পরিষদ কর্তৃক
সর্বসত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল ঃ
অগ্রহায়ণ ১৩৯৬
ডিসেম্বর ১৯৮৯

মূল্য ঃ পনর টাকা মাত্র

মুদ্রক ঃ
শহীদ সুলতান প্রেস
মগবাজার, ঢাকা

www.pathagar.com

উৎসর্গ—

সমাজে ঈন্‌সাফ প্রতিষ্ঠার
জন্য যে সকল নিবেদিতপ্রাণ
জীবনের বাজি রেখে জেহাদে
লিপ্ত— তাদের প্রতি।

www.pathagar.com

সূচীপত্র

১। আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম

ক) ভূমিকা ৭

খ) পরিচয়ের সংকট ১০

গ) আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীমঃ মানব জীবন-দর্শন ১৫

ঘ) আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীমঃ শাব্দিক অর্থ, তাৎপর্য এবং গুরুত্ব ১৬

ঙ) আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীমঃ পাঠের নির্দেশ কখন এবং কিভাবে নাযিল হয় ২১

চ) শেষ কথা ২২

২। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব কেন? ২৯

ক) মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব কেন? ৩০

খ) অসহায়ত্ব ৩৬

গ) দায়িত্ববোধশক্তি ৩৭

ঘ) ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সংকটঃ মূল কারণ এবং প্রতিকার ৩৯

ঙ) জীবন অর্থবোধক এবং উদ্দেশ্য ভিত্তিক ৪১

চ) শেষ কথা ৪৩

www.pathagar.com

লেখকের কথা

মানুষকে নিয়ে মানুষের চিন্তা-ভাবনার যেন কোন অন্তই নেই। ষড় রিপু আক্রান্ত মানুষকে লোভী, কামাতুর, ক্ষমতালোভী, স্বার্থান্ধ, পরশ্রীকাতর, নিষ্ঠুর, পরনির্ভরশীল, নীচ, হিংসা-দ্বেষে ভরপুর একটি জীব হিসেবেও যেমন আখ্যায়িত করা হয়েছে, ঠিক তেমনই আবার মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসাপূর্ণ দয়ালু এবং মহান সৃজনশীল প্রাণী হিসেবেও নামকরণ করা হয়েছে। অপরদিকে, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক মানুষকে তাঁর খলীফা হিসেবে বিশ্বের বুকে "আশ্‌রাফুল মাখলুকাত' হিসেবেই ঘোষণা দিয়েছেন।

মানুষ মানুষকে কি আখ্যা দিল বা দিচ্ছে সে দিকটি আমার বিবেচনার বিষয় নয়। কারণ, নানান দোষে-গুণে মানুষ বৈষয়িক এবং সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং তেমন পরিস্থিতিতে সে কখনও হয়ত বা মহান রূপে কারো কাছে আবির্ভূত হয়, অথবা হয় নিষ্ঠুর এবং নীচ রূপে। মানুষের রূপের কোন সীমা নেই, তবু 'মানুষ'-এর সংজ্ঞার একটা নির্দিষ্ট রূপ আছে। বৈষয়িক এবং সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা, কিম্বা বিনষ্ট করার মধ্য দিয়ে মানুষ মানুষের সংজ্ঞায় নানান সংযোজন এবং বিয়োজন ঘটানোর প্রক্রিয়ায় লিপ্ত থাকে।

কিন্তু মূল বিবেচনার বিষয় হচ্ছে মানুষকে কেন্দ্র করে আল্লাহ বা স্রষ্টার ঘোষণাটি। তিনি মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব বা "আশরাফুল মাখলুকাত" হিসেবে ঘোষণা দিলেন কেন? এ প্রশ্নটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে গিয়ে আমি বিভিন্ন সময়ে নানান দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগেছি। অবশেষে মনে হল আমি যেন এর একটা সঠিক উত্তর পেয়ে গেছি। তাই আর নীরব থাকতে পারলাম না। "মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব কেন" এই নামেই আমি একটি প্রবন্ধ লিখে বসি, যা 'দৈনিক সংগ্রাম'এবং পরবর্তীতে "মাসিক পৃথিবী" তে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ পায়। প্রবন্ধটি পাঠককুলের কাছে সমাদৃত হয় এবং অনেকেরই ইচ্ছা যে আলোচ্য প্রবন্ধটি পুস্তিকা আকারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা উচিত, কারণ প্রবন্ধটিতে নাকি কিছু মৌলিকত্ব রয়েছে। কিন্তু প্রবন্ধটির কলেবর তেমন বড় নয় বিধায় আমি নতুন ভাবে চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ি।' এই চিন্তা-ভাবনারই এক প্রক্রিয়ায় আমার মনে উঁকিঝুঁকি শুরু হয় আরেকটি প্রবন্ধ লেখার বিষয়বস্তু এবং সেটি হল- "আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম"-এর প্রকৃত তাৎপর্য বা গুরুত্ব নিয়ে। ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা উক্ত আয়াতটি যত সহজ ভাবে পাঠ করেন, আলোচ্য আয়াতটি কি তারা বুঝেই গুরুত্ব সহকারে পাঠ করেন, না কেবল আনুষ্ঠানিকতা বজায় রাখার জন্যই পাঠ করে থাকেন, এটাই আমার ভাবনার বিষয় হয়ে পড়ল। আমার উৎসাহ বৃদ্বি পেতে লাগল "আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম"-এর মর্মবাণী উদঘাটন করার লক্ষ্যে। এ ভাবেই আলোচ্য আয়াত ভিত্তিক চিন্তা-চেতনার ফসল হিসেবে আরেকটি প্রবন্ধ আল্লাহর রহমতে প্রস্তুত হয়ে গেল। আমি মর্মে মর্মেই উপলব্ধি করলাম যে, আলোচ্য আয়াতটির শাব্দিক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করাই কেবল যথেষ্ট নয়, আয়াতটির তাৎপর্য এবং গুরুত্ব অনুধাবন করার আবশ্যিকতা রয়েছে মানুষের জীবন-দর্শন নির্ধারণ করারই স্বার্থে।

www.pathagar.com

উক্ত আয়াত ভিত্তিক প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে জনাব মোহাম্মদ সেলিম মোস্তফা সাহেবের কাছ থেকে আমি প্রেরণা লাভ করেছি। সমাজে তাঁর বড় একটা পরিচয় নেই, তবে বুদ্ধিজ্ঞান এবং বিবেকের দিক থেকে নিঃসন্দেহে তিনি একজন বুযুর্গ ব্যক্তি। তাঁর আমি দোয়া প্রার্থী। প্রবন্ধটিতে যে অভিমত প্রকাশ পেয়েছে তার সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব আমারই। প্রবন্ধে ব্যক্ত অভিমতটিই যে চূড়ান্ত তেমন দাবী করার ধৃষ্টতা আমি পোষণ করছিনে। আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় আমার অভিমত আমি প্রকাশ করলাম কেবল। ব্যক্ত অভিমতের সংগে সকলেরই দ্বিমত পোষণ করার অধিকার রয়েছে। তবে পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, দ্বিমত পোষণ করার পূর্বে তারা যেন প্রবন্ধে ব্যক্ত দৃষ্টিভংগিটি যথার্থ গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করার চেষ্টা করেন।

সে যাই হোক, 'মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব কেন?' এবং 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম' এদুটি প্রবন্ধ যেহেতু মানুষের দৃষ্টিভংগি এবং মানুষের জীবন-দর্শনকে কেন্দ্র করে লেখা, তাই সঙ্গত কারণেই পুস্তিকাটির নামকরণ করা হয়েছে-"দৃষ্টিভংগি ও জীবন-দর্শন।"

আমি আন্তরিকভাবে আশা করছি যে, পুস্তিকাটি পাঠক-মহলকে মানুষের 'দৃষ্টিভংগি' এবং 'জীবন-দর্শন' সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে উৎসাহ জোগাবে।

অবশেষে, পুস্তিকাটি প্রকাশের মাধ্যমে যে সকল ভাইয়েরা ইন্সাফবর্জিত বাংলাদেশের জনগণের খেদমতে সময়মত পেশ করলেন, তাদের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা।

০৩/১১/৮৯
ঢাকা
বিনীতভাবেই
এম, এ, জলিল

www.pathagar.com

১। আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম ঃ

(ক) ভূমিকা ঃ

মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব 'আশরাফুল মাখলুকাত' এ সত্যটি সকল ধর্ম, মত, পথের মানুষই এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছে। বিষয়টি যখন সকল বিতর্কের উর্ধে, তখন স্বাভাবিক ভাবেই মনে একটি প্রশ্ন জাগে যে, এমন একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, জাতি, গোষ্ঠীর বিভক্ত মানুষ কি করেই বা পৌছল?

এমন একটি স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকৃতপক্ষে কি একই স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয়নি? ব্যাপারটি অবশ্যই তাই। স্রষ্টা এক এবং অভিন্ন। কেবল এক এবং অভিন্ন স্রষ্টার পক্ষেই সম্ভব সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে মানুষকে সৃষ্টি করা। স্রষ্টা ভিন্ন ভিন্ন হলে মানুষ সর্বসম্মতিক্রমে নিজেদেরকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' বা সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হত না। হিসেবে এবং দাবীতে দেখা দিত বেজায় গরমিল। নিজেদের এই মৌলিক আত্ম–পরিচয় দানের বিষয়ে মানুষ ইতিহাসের শুরু থেকেই একমত পোষণ করে এসেছে এবং এখন পর্যন্ত তা রয়েছে অব্যাহত। এই ঐকমত্যই প্রমাণ করে যে, জাতি, ধর্ম বর্ণ এবং গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকল মানুষই প্রকৃতিগত ভাবে 'আস্তিকবাদী' বা একই স্রষ্টায় বিশ্বাসী। এ বিশ্বাস তার আত্মার অন্তস্তলে দৃঢ়ভাবেই অবস্থানরত।

সুতরাং মানুষ মূলত জন্মগত ভাবেই 'আস্তিক' বা স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তাহলে স্বভাবতই আর একটি প্রশ্ন জাগে যে,মানব ইতিহাসের বিভিন্ন স্তরে, যুগে ও কালে এবং এমন কি বর্তমান মুহূর্ত পর্যন্ত যারা নিজেদেরকে 'নাস্তিক' বা স্রষ্টায় অবিশ্বাসী হিসেবে দাবী করত বা করে, কিম্বা নিজেদেরকে নাস্তিক বলে পরিচয় দিত বা এখনও দেয়, তারা কারা? মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে স্বীকার করে নেয়ার পরও তারা নিজেদেরকে স্রষ্টায় অবিশ্বাসী বা নাস্তিক ভাবতে শুরু করার কারণ বা যুক্তিটা কী? 'আশরাফুল মাখলুকাত' হিসেবে নিজেদের পরিচয়টা বহাল রেখেও তারা আশরাফুল মাখলুকাতের স্রষ্টাকে অস্বীকার করছে কেন?

স্রষ্টায় অবিশ্বাস বা 'নাস্তিকতাবাদ'–এর লালনের মধ্য দিয়ে তারা কি স্রষ্টার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের খেয়াল– খুশী মত জীবন গড়া এবং পরিচালনা করার বাসনা পোষণ করছে?

যিনি মানুষকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর মহা পরিকল্পনাকে বাদ দিয়ে মনগড়া পথে জীবন পরিচালনা করার মধ্য দিয়ে 'নাস্তিকবাদীরা' স্বয়ং স্রষ্টা কর্তৃক ঘোষিত মানুষের 'শ্রেষ্ঠত্ব' রক্ষা করবে কিসের জোরে?

www.pathagar.com

সকল জীবের উপরে যে শক্তি মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছেন কেবল সেই শক্তি প্রদত্ত বিধানই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় এবং বিকাশ করার একমাত্র উপায় নয় কী? কারণ যিনি মানুষকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' হিসেবে ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি স্বয়ং নিজেই সেই ঘোষিত শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা এবং বিকাশ করার জন্য মানুষের কাছে প্রেরণ করেছেন নির্দিষ্ট বিধান। স্রষ্টার ঘোষণা মোতাবেক নিজেদেরকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' হিসেবে পরিচয় দিয়ে বেড়াব, অথচ তাঁর অস্তিত্বে করব অবিশ্বাস এবং তাঁর বিধানকে করব অমান্য, এটা কি নিছক নির্বুদ্ধিতা অথবা পাগলামি নয়? এমন আচরণকে যদি নিছক নির্বুদ্ধিতা অথবা পাগলামি হিসেবে মেনে নেয়া হয়, তাহলে যারাই স্রষ্টার অস্তিত্বে অবিশ্বাস করে জীবন গড়ে তুলতে চাচ্ছে, তারা বুদ্ধিহীন অথবা পাগল। এই বুদ্ধিহীন, অথবা পাগল রচিত পথে অগ্রসর হয়ে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব কেন, মানুষের নিম্নতম গুণাবলী সহকারেও বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে উঠবে এবং তাদের নেতৃত্বে হচ্ছেও তেমনটি।

কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে যে, স্রষ্টায় অবিশ্বাসীরা বুদ্ধিহীনও নয়, নয় পাগলও। তারা বিরাজমান বিশ্বে প্রগতি এবং উন্নতির দাবীদার এবং সর্বরকম বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রযুক্তি এবং কৃৎকৌশলের দিক দিয়েও সমৃদ্ধ। তবে ধন-ঐশর্যের প্রাচুর্য, বেপরোয়া ইন্দ্রিয়-সুখকর আরাম-আয়েশ এবং প্রবল ক্ষমতাধর হওয়া সত্ত্বেও স্রষ্টায় অবিশ্বাসীরা শান্তি খুঁজে পাচ্ছে না, পাচ্ছে না মুক্তি খুঁজে। নানান রকম সংঘর্ষ-সংঘাত, দুর্ভোগ এবং বিভিন্ন জটিল মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা এবং ব্যাধি তাদের সৃষ্ট প্রযুক্তি এবং কৃৎকৌশল দ্বারা অর্জিত সুখ বিনষ্ট করে দিয়ে মানুষকে স্রষ্টা কর্তৃক ঘোষিত শ্রেষ্ঠ জীবের সোপান থেকে নিক্ষেপ করে চলছে নিকৃষ্ট স্বভাবের পশুতুল্য অবস্থানে- নিশ্চিত ধ্বংসযজ্ঞে।

যাদের বিশ্বাসে স্রষ্টা নেই, তাদের বিশ্বাসে আত্মা, বা রুহরও কোন অবস্থান নেই। কিন্তু ইন্দ্রিয়-সুখভোগ এবং জাগতিক প্রাচুর্যের বহর তাদের অশান্তি নিরসন করতে সক্ষম হয়নি- তাদের ভেতরে আজ শান্তি এবং মুক্তি অর্জন করার লক্ষ্যে প্রচন্ড ক্রন্দন পরিলক্ষিত হচ্ছে।

স্রষ্টায় অবিশ্বাস এবং স্রষ্টা প্রদত্ত বিধানকে অস্বীকার করে যারা নিজেদের বুদ্ধি, প্রযুক্তি এবং কৃৎকৌশলের উপর ভর করে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা এবং বিকাশের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে মানব সভ্যতা রচনা করার খায়েশ পোষণ করেছিল, তাদের নেতৃত্ব আজ অসহায়ত্ব প্রকাশ করে চলছে কেন? তাদের ভেতরে আজ শান্তি এবং মুক্তির ক্রন্দন এবং হাহাকার কেন? কার এ ক্রন্দন? কে কাঁদছে ভেতরে? এর জবাব স্রষ্টার অবিশ্বাসীরা এখনও স্পষ্ট ভাবে না দিলেও আকারে-ইংগিতে তারা ইতিমধ্যেই ধর্মে বিশ্বাসের আবশ্যিকতা মেনে নিয়েছে, মেনে নিয়েছে মানুষের আত্মিক চাহিদা পূরণের বাস্তবতাকে- অর্থাৎ কিনা মানুষের মধ্যে 'আত্মা'র অস্তিত্ব রয়েছে এর স্বীকৃতি দিয়েছে তারা। তাদের বোধোদয়ের জন্য স্রষ্টারই কৃতিত্ব। মানুষের 'আত্মা' যে কেবল ইন্দ্রিয়-সুখভোগ কিম্বা প্রাচুর্যমূখী তা নয়, আত্মার চাহিদা জাগতিক উন্নতি-প্রগতির চমকে পূরণ হবার নয়। স্রষ্টার অস্তিত্বের অস্বীকার এবং স্রষ্টার বিধান পরিহার করে মানুষ কর্তৃক নিজ মনগড়া

www.pathagar.com

পথের অনুসরণ আত্মাকে সংকুচিত করে রাখে, আত্মাকে করে তোলে নিষ্প্রভ এবং তখনই মানুষের অভ্যন্তরে শুরু হয় আত্মার ক্রন্দন এবং সে ক্রন্দন স্রষ্টায় অবিশ্বাসীদের দ্বারা অর্জিত সকল উন্নতি, প্রগতি এবং প্রাচুর্যকে ম্লান করে দিয়ে ক্রমশই বেগবান হতে থাকে। স্রষ্টার অস্তিত্বে অবিচল বিশ্বাস স্থাপন এবং স্রষ্টা কর্তৃক নির্ধারিত বিধান মোতাবেক মানুষ মানুষের কল্যাণধর্মী কর্মকান্ড অব্যাহত রাখার মধ্য দিয়ে স্রষ্টার নৈকট্য লাভের বাসনা এবং অঙ্গীকার সহকারে অগ্রসর না হওয়া পর্যন্ত আত্মার চাহিদা পূরণ হবে না– পরিসমাপ্তি ঘটবে না আত্মার ক্রন্দনের। কারণ অবিনশ্বর আত্মা সদাই স্রষ্টামূখী। মানুষ স্রষ্টামুখী হলেই আত্মা তৃপ্ত হতে শুরু করে এবং তৃপ্ত–আত্মাধারী মানুষই কেবল মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা এবং লালন করতে সক্ষম। তৃপ্ত আত্মাধারী মানুষই কেবল সক্ষম জগতে মানুষের কল্যাণ, শান্তি এবং মুক্তি নিশ্চিত করতে।

স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ জীব হওয়া সত্ত্বেও যারা স্রষ্টাকে অস্বীকার এবং প্রত্যাখ্যান করে চলার ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে, তারা নিঃসন্দেহে মূর্খ বিদ্রোহী– 'ইবলিসের খুদে চেলা।'

স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়েও স্রষ্টার কেবলমাত্র একটি আদেশ অমান্য করার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করার ফলে ইবলিস হয়েছে চির অভিশপ্ত–নিক্ষিপ্ত হয়েছে অশান্তি এবং অতৃপ্তির অনির্বাণ অনলে। অপরদিকে, স্রষ্টার অস্তিত্ব অস্বীকারকারী এবং স্রষ্টার সকল আদেশ–নির্দেশ এবং বিধান অমান্যকারী এবং প্রত্যাখ্যানকারী মানুষের আত্মা নিজেদের মূর্খ প্রয়াস ও প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে শান্তি এবং তৃপ্তিতে ভরপুর হয়ে যাবে এমনটা আশা কিম্বা কল্পনা করারও কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকতে পারে না। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ এখন পর্যন্ত উক্ত সত্যটি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হচ্ছে। নিজের মূর্খতা, ঔদ্ধত্য, জেদ, অতৃপ্তি এবং অশান্তি থেকে জন্ম নেয়া সেই অভিশপ্ত ইবলিসের ক্রোধ স্রষ্টার সৃষ্ট 'আশরাফুল মাখলুকাত'কে ছলে–বলে–কলে–কৌশলে প্রতারিত, বিভ্রান্ত এবং স্রষ্টার ঘোষিত অভিশপ্ত এবং অবাঞ্ছিত পথে নিক্ষিপ্ত করার জন্য স্রষ্টার কাছ থেকে শক্তি প্রার্থনা করে নিয়ে এসেছে। অভিশপ্ত ইবলিস তাই সেই অর্থেই কেবল শক্তিধর এবং এই ক্ষিপ্ত ইবলিস মানুষকে প্রতিনিয়ত লোভ, লালসা, মোহ, হিংসা, দ্বেষ এবং স্রষ্টায় অবিশ্বাস করার প্ররোচনা যুগিয়ে মানুষকে সার্বিক মঙ্গল ও কল্যাণের পথ থেকে বিচ্যুত করে অমঙ্গল, অকল্যাণ, অশান্তি এবং অতৃপ্তির পথে ঠেলে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। স্রষ্টার কেবলমাত্র একটি আদেশ অমান্যকারী ইবলিস নিজ সাধনা কর্তৃক অর্জিত অবস্থান থেকে বিচ্যুত এবং বিতাড়িত হওয়ার পর্বে স্রষ্টার কাছ থেকেই একটি অনুমতি নিয়ে বেরিয়েছে এই মর্মে যে, সে (ইবলিস) জগতে স্রষ্টা প্রেরিত 'আশরাফুল মাখলুকাত'কে পদে পদে ফাঁদে ফেলবে, দুনিয়ার মিথ্যে মায়াজালে মরণশীল শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে জড়িয়ে ফেলে স্রষ্টার ইচ্ছা, পরিকল্পনা এবং বিধানের বিরোধিতা মানুষকে দিয়েই ঘটাবে।

স্রষ্টা বিতাড়িত ইবলিসের অভিশপ্ত অভিলাষ পূরণের সীমিত শক্তি এবং স্বাধীনতা স্রষ্টা ইবলিসকে দিয়েছেন বলেও পবিত্র ঐশী কোরআনে উল্লেখ রয়েছে।

www.pathagar.com

ঠিক তেমনিভাবে স্রষ্টা মানুষকে তাঁর নিজস্ব 'সিফত' দিয়ে দুনিয়ায় তাঁরই খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবেও প্রেরণ করেছেন। মানুষের কাছে যুগে যুগে প্রেরণ করেছেন তাঁর নির্বাচিত নবী ও রাসূল। স্রষ্টা বিভিন্ন সময়ে প্রেরণ করেছেন ঐশী বিধান। ঐ সকল ঐশী বিধানেই স্রষ্টা মানুষকে ইবলিস শয়তানের ধোকা থেকে মুক্ত থাকার জন্য বিশেষ বিশেষ নির্দেশও সন্নিবেশিত করে দিয়েছেন। স্রষ্টার সৃষ্ট খলীফা মানুষ স্রষ্টার বিধান মোতাবেক নিজেদের জীবন পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করার পথে অবিচল থাকলে ইবলিসের সকল ধোকা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে অবশ্যই সক্ষম হবে। মানুষ নিজেদের মধ্যে স্রষ্টা কর্তৃক প্রেরিত নবী এবং রাসূল এবং ঐশী বিধান লাভ করার পরও যদি ইবলিসের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে, তাহলে তার অর্থ এটাই দাঁড়ায় যে, ঐ সকল মানুষ না পেয়েছে স্রষ্টার পরিচয়, না জেনেছে অভিশপ্ত ইবলিসের পরিচয় আর না-ই বা তারা জেনেছে তাদের নিজেদের পরিচয়। কারণ পরিচয় জ্ঞান লাভের মধ্য দিয়েই সঠিক সম্পর্ক স্থির করা সম্ভব এবং সম্পর্ক স্থির না হওয়া পর্যন্ত সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধা, কিম্বা ঘৃণা প্রকাশ করারও কোন অনুভূতি জাগ্রত হয় না মনে। তাই 'মানুষ' 'স্রষ্টা' এবং 'শয়তান'-এর সঠিক পরিচয় জানার উপরই নির্ভর করবে সম্পর্কের রূপ। পরিচয় জ্ঞানহীন মানুষ তাই জীবন পথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে ভুল করে। স্রষ্টা, ইবলিস (শয়তান) এবং মানুষের নিজের সঠিক পরিচয় না জানার সংকটই মানুষ কর্তৃক জগতে ভ্রান্ত পথ অনুসরণ করার পেছনে মূল কারণ। এটা মূলত পরিচয়ের সংকট। উক্ত সংকট সঠিক 'ইলম' বা জ্ঞান অর্জনের মধ্য দিয়েই কেবল মোকাবেলা করা সম্ভব। 'ইলম' অর্জনের পথই সংকট উত্তরণের যোগ্য মাধ্যম।

(খ) পরিচয়ের সংকট

কোন বস্তু কিম্বা সত্তার পরিচয় জানা না থাকলে তার সঠিক ব্যবহার অথবা তার প্রতি মানুষের আচরণও সঠিক হয়ে ওঠে না। মানুষের এই অজ্ঞানতাই অসচেতনতা জন্ম দেয় এবং এই অসচেতনতার কারণেই মানুষ কোন বস্তু কিম্বা ব্যক্তির প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে, হয়ে ওঠে উদাসীন এবং নির্লিপ্ত অথবা অপব্যবহারে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং মানব জীবনের যাবতীয় বিভ্রান্তির মূলে রয়েছে পরিচয়ের অথবা পরিচয়-জ্ঞানের সংকট।

আগুনের পরিচিতি সম্পর্কে যার জানা নেই, তার কাছে আগুনের অবস্থান থাকা সত্ত্বেও সে আগুনের সদ্ব্যবহার করতে পারবে না, বরং অজ্ঞানতা নিয়ে আগুনের দিকে হাত বাড়ালেই সে তার নিজেরই ক্ষতি সাধন করে বসবে। অপরদিকে, আগুন সম্পর্কে সঠিক 'ইলম' বা জ্ঞান সমৃদ্ধ ব্যক্তি আগুনের সাহায্যে শুধু যে কেবল নিজেরই উপকার সাধন করবে তা নয়, বিশ্ব-সভ্যতায়ও নতুন নতুন অবদান রাখতে সক্ষম হবে। আগুন আবিষ্কারের ঘটনা যে মানব ইতিহাসের ধারাই পাল্টে দিয়েছে, সে ইতিহাস কার না জানা। ঠিক একই ভাবে পানি সম্পর্কেও বলা যায়। পানি সম্পর্কে অজ্ঞানতা, পানির অবস্থান কাছে থাকা সত্ত্বেও হয়ত চরম তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিটিও কাছে অবস্থিত পানি ছেড়ে

www.pathagar.com

ছুটোছুটি করে বেড়াবে এদিকে-ওদিকে। তৃষ্ণা আছে, নেই কেবল তৃষ্ণা নিবারণকারী বস্তুর সংগে পরিচয়। সব বস্তু সম্পর্কেই একই কথা প্রযোজ্য, যদি সে সকল বস্তুর সঠিক পরিচয় মানুষের জানা না থাকে। কোন বস্তুরই সে ব্যবহার জানবে না- কোন বস্তুই তার কোন উপকারে আসবে না। প্রত্যাশিত বস্তুটি নিজের অতি নিকটে অবস্থানরত থাকা সত্ত্বেও কেবল অজ্ঞানতা বা বস্তুর সঠিক পরিচয়-জ্ঞানের অভাবেই তার প্রত্যাশা অপূরণই থেকেযাবে।

ঠিক তেমনি ব্যক্তির পরিচয় সম্পর্কেও ঐ একই যুক্তি এবং কথা প্রযোজ্য। সম্মুখে উপস্থিত কোন আগন্তুকের সঠিক পরিচিতি জানার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সেই আগন্তুকের প্রতি কেমন আচরণ করা উচিত, তা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। আগন্তুকের সঠিক পরিচিতি না জানা পর্যন্ত আমাদের আচরণে কোন না কোন দোষ-ত্রুটি থেকেই যাবে এবং এটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক। নতুন আগন্তুকটিকে প্রথম দৃষ্টিতে হয়ত বা পছন্দসই নাও হতে পারে, কিম্বা তাকে আদর-আপ্যায়ন করারও হয়ত কোন চিন্তাই আমাদের মাঝে না ঘটতে পারে। কিন্তু যেই মুহূর্তে আমরা জানতে পারি যে, আগন্তুকটি আমাদের কাছে নতুন এবং অপরিচিত হলেও তিনি আমাদেরই কোন ঘনিষ্ঠ আত্নীয় অথবা আমাদেরই কোন প্রিয়জনের আত্নীয়, ঠিক তখনই কিন্তু আমরা তার যথাযথ আপ্যায়নের জন্য ব্যকুল হয়ে উঠি এবং নিজেদের দোষত্রুটির জন্য লজ্জাবোধ করতে থাকি অথবা প্রকাশ্যেই ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে পড়ি। অপরদিকে, আত্নীয় নয় এমন একজন আগন্তুক যিনি সুপন্ডিত ও মহান ব্যক্তিত্ব, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী অথবা বিত্তশালী সম্মানিত ব্যক্তি, তাঁর আসল পরিচয় জানার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর প্রতি আমাদের সঠিক আচার-আচরণ কি ধরনের হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করা সহজ নয়- পরিচয়ের অজ্ঞানতাবশত অমন ব্যক্তিটির সাথেও আমরা কোন না কোন ধরনের বেয়াদবী করে বসতে পারি এবং সেটা মোটেও অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তাঁর সঠিক পরিচয় জানার সাথে সাথেই আমাদের মধ্যে যে আকস্মিক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়ে যায়, সে চাঞ্চল্য কিন্তু আমরা কোন মতেই আর লুকোতে পারি না। তাঁর প্রতি আমাদের আচার-আচরণ অত্যধিক বিনীত হয়ে ওঠে এবং আমরা সহসাই তাঁকে সম্মানিত জন ভেবে আপ্যায়নের জন্যও হয়ে উঠি অধীর। এতো গেল জগতের বস্তু এবং ব্যক্তি পরিচয় জ্ঞান বা অজ্ঞানতার প্রসঙ্গ।

এবারে আসা যাক স্রষ্টা বা আল্লাহ প্রসঙ্গে। মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার বেশ কিছু কাল পর অর্থাৎ মানুষের বয়স দু' থেকে তিন বছর হতেই স্রষ্টা বা আল্লাহর কথা পিতা-মাতা এবং প্রিয়জনেরা শিশুকে বলতে থাকে; কিন্তু স্রষ্টা সম্পর্কে তার ধারণা থাকে শূন্যের কোঠায়। যতই বয়স, জ্ঞান এবং বুদ্ধি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং শিশুটি শৈশব অবস্থা কাটিয়ে কৈশোর এবং যৌবনে পদার্পণ করে, সে স্রষ্টা সম্পর্কে হয়ত বা একাকী চিন্তা করে, মনে-প্রাণে বিশ্বাসও করতে শুরু করে স্রষ্টাকে। কখনও বিশ্বাস এবং অবিশ্বাসও করা শুরু করে, সংগী-সাথীদের সাথে স্রষ্টা সম্পর্কে আলোচনা করে এমন কি তর্ক-বিতর্কেও লিপ্ত হয়ে পড়ে। স্রষ্টার উপর অন্ধ বিশ্বাসে কখনও বা তার মনপ্রাণ ভরপুর হয়ে

www.pathagar.com

উঠে, আবার পরমুহূর্তেই হয়ত বা স্রষ্টার প্রতি আসে অবিশ্বাস এবং সিদ্ধান্তহীনতার দোলনায় দুলতে থাকে তার মন। এটা তার চরিত্রগত কোন ত্রুটি নয়– একে ত্রুটি বলা চলে না, কারণ স্রষ্টাকে সে অন্যান্য বস্তু বা ব্যক্তির রূপে চোখে দেখে না। স্রষ্টা সম্পর্কে সে যা কিছু শিখে বা জানে তা আলাপ–আলোচনা অথবা বইয়ের পাতা থেকেই শিখে এবং জানে। ঐসব আলাপ–আলোচনা ত্রুটিমুক্ত নয়– ত্রুটিমুক্ত নয় মানব রচিত পুস্তিকাদির পাতা। জ্ঞানহীন অন্ধবিশ্বাসজনিত আবেগ ও শক্তির উপর ভর করে মানুষ অনন্ত এবং অসীম স্রষ্টা সম্পর্কে সঠিক কোন ধ্যান–ধারণা লাভে সক্ষম হয় না এবং তাই নিরাকার আল্লাহ বা স্রষ্টার সঠিক পরিচয় সম্পর্কে সে থাকে সম্পূর্ণ ভাবেই অচেতন এবং কতকটা অনাগ্রহী। তাই আল্লাহর কাছ থেকে অযাচিত ভাবেই অসংখ্য নিয়ামত লাভ করার পরও আল্লাহ সম্পর্কে তার উদাসীনতা কাটে না। আল্লাহর প্রেরিত ঐশী বিধানে আল্লাহর পরিচয় বিভিন্ন ভাবেই লিপিবদ্ধ রয়েছে। সেথায় ঘোষিত রয়েছে আল্লাহর গুণাবলীর বিশেষ বিবরণ। বিশেষ করে পবিত্র কোরআনে স্রষ্টা বা আল্লাহ সম্পর্কে এত কিছু ঘোষিত রয়েছে যে, যদি কোন মানুষ পবিত্র কোরআন পুনঃপুন অর্থ সহকারে অধ্যয়ন করতে থাকে, তাহলে স্রষ্টার পরিচয় লাভে সে সক্ষম না হয়েই পারে না উদাহরণ স্বরূপ এখানে আল্লাহ বা স্রষ্টার পরিচয় সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করছিঃ

সূরা ফাতিহায় আল্লাহ সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে যে, "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাকের জন্য, যিনি বিশ্ব জগতের প্রতিপালক। এখানে আমরা জানতে পারছি আল্লাহই বিশ্ব জগতের প্রতিপালক এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই জন্য। অহংকার করার মত মানুষের কাছে এমন কিছুই নেই।

এরপরে ঘোষণা করা হচ্ছে "আররাহমানির রাহীম" অর্থাৎ 'যিনি পরম দয়ালু বা অযাচিত দানকারী' আবার রাহীম শব্দ দিয়ে বুঝিয়েছেন দয়ালুকে। আল্লাহ অযাচিত ভাবে দান করেন এবং যাচনা বা প্রার্থনা করলেও প্রার্থনার তুলনায় অধিক দান করেন। তাহলে স্রষ্টা বা আল্লাহ হচ্ছেন পরম দয়ালু এবং অযাচিত দানকারী, অর্থাৎ কিনা স্রষ্টা তাঁর সৃষ্ট জীবকে চাওয়া ব্যতিরেকেই দান করে থাকেন– যেমন তিনি আমাদের জীবন ধারণের জন্য দান করেছেন আলো, বাতাস, পানি, ফলমূল আরো কতো কি– যা আমরা তাঁর কাছ থেকে চেয়ে অর্জন করিনি। স্রষ্টা এতই দয়ালু যে, তিনি আমাদের জন্মের পূর্বেই এ সকল দান করে রেখেছেন, যাতে জন্মের সাথে সাথেই আমরা তাঁর দানকৃত সামগ্রীর সহযোগিতায় বেঁচে থাকতে পারি। মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হওয়ার পূর্বে পিতামাতা সম্ভাব্য সন্তানের জন্য আল্লাহকে এ কথা কখনো বলে না যে, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার সন্তানকে দুটি হাত, দুটি পা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা সহকারেই দান কর।' না, এমনটি প্রার্থনা করা হয় না। পিতামাতার প্রার্থনা ছাড়াই আল্লাহ যা কিছু দান করেন, তা অযাচিত ভাবেই তিনি দান করে থাকেন–অর্থাৎ কিনা, যাচনা করা ছাড়াই যা কিছু পাওয়া যায় তাকেই অযাচিত দান বলা হয। তাহলে আল্লাহ বিশ্বের প্রতিপালক, তিনি পরম দয়ালু এবং অযাচিত দানকারী। তিনি মানুষের সকল প্রয়োজন সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, তারপরও মানুষকে আরো চাওয়ার জন্যও তাগিদ দিচ্ছেন। "মালিকি ইয়াও মিদ্দীন"– যিনি বিচার

www.pathagar.com

দিনেরও মালিক। কোন্ বিচার দিনের মালিক তিনি? লক্ষ কোটি বছরে জন্ম নেয়া মানব জাতির কি কেবল একদিনই বিচার হবে? বিচারের প্রকৃত অর্থ কি? তাহলে, 'আল্লাহ বিচার দিনেরও মালিক' এর অর্থ কি? কোন্ বিচার দিনের? এর সঠিক তাৎপর্য কি? আল্লাহর পরিচয় পেতে হলে এ সম্পর্কে গভীর ভাবেই ভাবতে হবে। মানুষের সাধারণত ধারণা যে, একদিন এ বিশ্ব জগত ধ্বংস হয়ে কিয়ামত সাধিত হবে এবং মৃত সকল মানুষকে স্রষ্টা পুনরায় পূর্বের রূপেই উত্থিত করবেন এবং তখন শেষ বিচার হবে হাশরের ময়দানে এবং আল্লাহ স্বয়ং হাযির থেকে সে বিচার করবেন। এমন একটি ধারণা সম্পর্কেই সাধারণত আলিম-উলামা মানুষকে হুশিয়ার করতে থাকেন। এটা অবশ্য একটা দিক। এথেকে আল্লাহর বিচারের রূপ বুঝে ওঠা দায়। এদিকটি মানুষের সাধারণ বুদ্ধির বাইরে। 'আল্লাহ বিচার দিনের মালিক' এর অর্থকে এখানে অত্যন্ত সরলীকরণ করা হয়েছে। আমাদের অন্তত একবার ভেবে দেখা দরকার যে, সেই কাংখিত বিচারের দিন ব্যতীত আল্লাহর কি আর কোনই কর্ম নেই- কোনই বিচার নেই? এটা কী করেই বা সম্ভব? দুনিয়া সৃষ্টি করেই কি আল্লাহ কর্মহীন হয়ে বসে পড়লেন (নাউযুবিল্লাহ)! যিনি পরম দয়ালু এবং অযাচিত দানকারী সব কিছু সৃষ্টি করেই কি তিনি খালাস? তিনি সৃষ্ট দুনিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত পাষাণ মূর্তির মতই(নাউযুবিল্লাহ) নির্বিকার, নির্লিপ্ত সত্তা হিসেবে অবস্থান করতেই থাকবেন? দুনিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত জুলুমকারীরা কেবল জুলুমই করতে থাকবে? না, তা কখনই হতে পারে না। যিনি মানুষ এবং বিশ্ব সহ সব কিছু সৃষ্টি করেছেন এর রক্ষা,লালন এবং বিকাশের ধারা অব্যাহত রাখার প্রয়াসে তাঁকে সর্বত্র, সর্বব্যাপী, সদাজ্ঞানী, সদা জাগ্রত থাকতেই হবে। বিশ্বের প্রতিপালক সদা জাগ্রতই রয়েছেন। অন্যথায়,মানুষ সহ এ বিশ্ব মুহূর্তের জন্যও টিকে থাকতে পারত না। মানুষ সহ বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর উপর তাঁর সদা নিয়ন্ত্রণ বহাল রয়েছে, বহাল রয়েছে এক মহা পরিকল্পনা যার মাধ্যমে বিশ্ব আলো,বাতাস, পানি, ফলমুল, ফসল এবং অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য প্রতিনিয়ত পেয়েই যাচ্ছে। সূর্যও আলো দান বন্ধ করছে না; বাতাসও শেষ হয়ে যাচ্ছে না; মাটিও ফসল দেয়া বন্ধ করে দিচেছ না; বৃক্ষরাজিও ফলমুল ফলানো ছেড়ে দিচ্ছে না। সবকিছুই তো একটা শৃংখলার সংগে ঘটে যাচ্ছে। এই শৃংখলার সাথে সব কিছু ঘটে যাওয়ার নীরব প্রক্রিয়াটিই স্রষ্টার প্রতিনিয়ত বিচারের রূপ নয় কী? হ্যাঁ, আল্লাহ সদা জাগ্রত বিচারক বলেই উপরোক্ত সব কিছু একটা নিয়ম এবং শৃংখলার অন্তর্ভুক্ত হয়ে মানুষের জীবন ধারণকে করে তুলেছে সম্ভব এবং সহজ এবং মানুষকে আল্লাহ প্রচুর সুযোগ দান করেছেন দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত সামগ্রীর মধ্য দিয়ে আল্লাহকে চিনতে এবং তাঁরই সাহায্যমুখী হয়ে থাকতে। আল্লাহ "আহাদ"। সূরা ইখলাসে ঘোষণা রয়েছে- "কুলহু আল্লাহু আহাদ" অর্থাৎ আপনি বলুন, তিনি আল্লাহ পাক, যিনি এক, একক, অদ্বিতীয়, অবিভাজ্য। তাঁর অসীম সত্তার সাথে কাউকেই শরীক করা যায় না। পবিত্র কোরআনে আল্লাহকে সর্বশক্তিমান, একক সত্তা হিসেবে বার বার ঘোষণা করা হয়েছে। স্রষ্টা স্বনির্ভর- পরিপূর্ণ ভাবেই আত্ম নির্ভরশীল। তিনি সাহায্য দানকারী, সাহায্য গ্রহণকারী কখনও কিম্বা কোন অবস্থাতেই নন। তাই স্রষ্টাকে সূরা ইখলাসে 'সামাদ' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। কারো সাহায্য ব্যতীতই তিনি সদা সক্রিয় ছিলেন, আছেন এবং

www.pathagar.com

থাকবেন। সুরা ইখলাসে স্রষ্টাকে "লাম ইয়ালিদ, ওয়া লাম ইউলাদ " হিসেবেও ঘোষণা করা হয়েছে –অর্থাৎ কিনা, তিনি কাউকে জন্ম দানও করেননি এবং তিনি কারো দ্বারা জাতও নন। অন্য কথায়, তিনি ছিলেন, তিনি আছেন, তিনি থাকবেন, তিনি জীবন-মরণের উর্ধের একটি পরম সত্তা। তিনি সব কিছুরই শুরু ও শেষ-এর সীমায় আবদ্ধ নন। সুরা ইখলাসে সর্বশেষ ঘোষণা হচ্ছে-'ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওন আহাদ" এবং তাঁর সমতুল্য কেহই নেই। তিনিই সর্বেসর্বা সৃষ্টিকুলের কোন কিছুই সর্বেসর্বা হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। পবিত্র ঐশী কোরআনের পাতায় পাতায় স্রষ্টার অসংখ্য পরিচয় স্রষ্টা নিজেই তাঁর প্রেরিত রাসুলের কাছে 'ওহীর' মাধ্যমে ঘোষণা করে দিয়েছেন, যাতে সৃষ্টির সেরা মানুষ স্রষ্টার সত্যিকারের পরিচয় লাভ করার পর একমাত্র তাঁরই নৈকট্য লাভের জন্য সর্বরকম সাধনায় লিপ্ত থাকে। স্রষ্টার এই পরিচয় সম্পর্কে একবার জ্ঞাত হলে তাঁরই সৃষ্ট মানবকুল তাঁকে অস্বীকার করবে কোন্ যুক্তিতে? তাঁকে অথবা তাঁর প্রণীত বিধানকে অমান্য করে চলবে কোন্ সাহসে? স্বেচ্ছায় এবং সজ্ঞানে নিজ শান্তি এবং মুক্তির পথ কে-ই বা পরিত্যাগ করতে চায়? পরিত্যাগকারী হয়ত বা অবুঝ, না হয় সজ্ঞানেই সে শয়তানের অনুসারী।

এতো গেল স্রষ্টার পরিচয় সম্পর্কে কিছু ঘোষণা। অনুরূপ ভাবে, স্রষ্টার সৃষ্ট জীব মানুষ সম্পর্কেও রয়েছে বহু ঘোষণা, রয়েছে শয়তান সম্পর্কে স্পষ্ট স্রষ্টার ঘোষণা। পরিচয়ের সংকটের কারণেই সৃষ্টির সেরা মানুষ জীবন দর্শন বেছে নিতে কেবল ভুলই করছে না, শয়তানের মতই বিদ্রোহী হয়ে মর্জি মাফিক জীবন দর্শন সৃষ্টি এবং তা বেপরোয়াভাবেই অনুসরণ করার পথ বেছে নিয়ে নিজেদের জীবন, পরিবেশ এবং পরিস্থিতিকেও করে তোলে বিষময়। এই বিষময় পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং জীবন দর্শন বেছে নেয়ার বিভ্রান্তি থেকে মানুষের কি পরিত্রাণ নেই? বিশ্বজুড়ে বিভ্রান্তির যে মায়াজাল ছড়িয়ে রয়েছে মানুষ কি কেবল অসহায়ের মতই সেই ছড়ানো মায়াজালের সহজ শিকারে পরিণত হতে থাকবে? কিন্তু স্রষ্টা তো মানুষকে সৃষ্ট সকল জীবের উপরে শ্রেষ্টত্ব প্রদান করেছেন। মানুষের মধ্যে প্রদান করেছেন অফুরন্ত সম্ভাবনাময় উপাদান যার পরিপূর্ণ বিকাশের মধ্য দিয়ে মানুষেরই মুখ হয়ে উঠবে আল্লাহর মুখ, মানুষেরই হাত হয়ে উঠবে আল্লাহর হাত এবং তামাম মাখলুকাতই মানুষের হুকুমের গোলাম হয়ে যাওয়ার কথাও ঘোষনা রয়েছে।

"মাল্লাহুল মাওলা, ফালাহুল কুল"- অর্থাৎ কিনা যে ব্যক্তি আল্লাহর হয়ে যায় তামাম মাখলূক তার হুকুমের গোলাম হয়ে যায়া। এ সত্য জানার পরও মানুষ এমন উচ্চতর অবস্থানে আরোহণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে কেন? মানুষের অধপতিত অবস্থার জন্য দায়ী কে? মানুষের বিরাজমান অধপতিত অবস্থার জন্য প্রকৃত পক্ষে মানুষই দায়ী। মানুষ মুলত তার অজ্ঞতাবশতই জীবন দর্শন বেছে নিতে ভুল করছে। স্রষ্টা কর্তৃক ঘোষিত সৃষ্টির সেরা মানুষের জীবন তাৎপর্যহীন, পরিকল্পনাহীন এবং দর্শনবিহীন হতেই পারেনা। স্রষ্টারই মহা পরিকল্পনা এবং তাঁর রাসুলের (সঃ) মাধ্যমে প্রেরিত বিধানই কেবল মানুষকে সত্য, কল্যাণ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করবে। এই সুনির্দিষ্ট পথের বিকল্প যা কিছু রয়েছে সেথায় রয়েছে শয়তানের অবাধ বিচরণ। এ ব্যতীত অপর যে কোন পথ ও

www.pathagar.com

মতের অনুসরণ করার অর্থই হচ্ছে , স্রষ্টার মহাপরিকল্পনাকে অস্বীকার করা, স্রষ্টা প্রদত্ত ঐশী বিধানকে অমান্য করে খেয়ালখুশী ও মর্জি মাফিক জীবনপথে চলার ঝুঁকি নেয়া। ঈমানের পথকে প্রত্যাখ্যান করে ঈমানহীন পথে পা বাড়ানোর অর্থই হচ্ছে অনিশ্চিত এক গন্তব্যস্থলের দিকে যাত্রা শুরু, যা অন্ধকারাচ্ছন্ন হতে বাধ্য। কারণ পবিত্র কোরআনে আল্লাহর স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে "আল ঈমানু নুরুন ওয়াল কুফরু জুলমাত " অর্থাৎ ঈমান আলোর ন্যায়,আর কুফর অর্থাৎ ঈমান হীনতা অন্ধকার। এই ঈমান রক্ষা করে জীবন দর্শণ খুঁজে বের করতে হলে মানুষকে "আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম"–এর সঠিক তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে, যা প্রকৃত অর্থে মানুষকে একটি সঠিক জীবন–দর্শন দান করে। অর্থে মানুষকে একটি সঠিক জীবন দর্শন দান করে।

(গ) আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম ঃ মানব জীবন দর্শন

লেখার মূল বিষয়বস্তু যেহেতু আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম, সেহেতু উক্ত নির্দেশটির তাৎপর্য সম্পর্কেই বিশদভাবে আলাচনা করা হবে। যে আয়াতটি মুসলমান মাত্রই অহরহ উচ্চারণ করে থাকে, তা আবার জীবন দর্শন হতে যাবে কি করে? প্রশ্নটি অত্যন্ত স্বাভাবিকও বটে, তবে এটাই এ নির্দেশ সম্পর্কে পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা নয় বলে আমি মনে করি। এর অর্থ মোটেই এ নয় যে, আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম–এর তাৎপর্য কোন অংশে গৌণ। না, মোটেও তা নয়। এ আয়াতটি সম্পর্কে এর পূর্বে এমন ভাবে কেউ চিন্তা বা গবেষণা করেছে বলে আমার জানা নেই। আশৈশব আমি উক্ত নির্দেশটি শুনে এসেছি, নিজে অহরহ পাঠও করেছি। এর শাব্দিক অর্থ হিসেবে কেবল এতটুকু জেনেছি যে, 'আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ্ পাকের নিকট আশ্রয় চাচ্ছি'। ব্যস, কেবল এতটুকুই অবগত ছিলাম যে, কোন পবিত্র, বা শুভ কাজ শুরু করার পূর্বে আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম পড়া কর্তব্য। কারণ হিসেবে জ্ঞাত ছিলাম যে, পবিত্র কিম্বা কোন শুভ কাজ উক্ত আয়াত পাঠের মধ্য দিয়ে শুরু করলে শয়তানের দ্বারা পবিত্র বা শুভ কাজটি বিনষ্ট হতে পারে না অর্থাৎ, কাজটি শয়তানের আছর বা প্রভাবমুক্ত থাকে। মুসলমানদের মধ্যে কেউ তা পড়ে থাকেন আল্লাহ তাআলার পবিত্র কালাম হিসেবে– নির্দেশরূপে। কেউ বা পড়েন না বুঝেই আনুষ্ঠানিকতা রক্ষা করার জন্যই কেবল, আর কেউ বা পাঠ করেন স্বার্থের বশবর্তী হয়ে যাতে তার শুভ কাজটি শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে। মানুষের জন্ম, মৃত্যু, মীলাদ মাহফিল, যে কোন ব্যবসায়িক, সামাজিক এমন কি রাজনৈতিক সভাকে কেন্দ্র করে এমনভাবেই পাঠ করা হচ্ছে যে, বর্তমানে আউযুবিল্লাহ পাঠ রীতিমতন একটি নিছক আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়ে পড়েছে। সংখ্যাগরিষ্ট মুসলমানের দেশে সকলেই যেহেতু যে কোন আনুষ্ঠানিকতা পর্ব শুরু করার পূর্বে আউযুবিল্লাহ পাঠ করে, সেহেতু তা পাঠ না করলে সমালোচনা হতে পারে, কিম্বা বিষয়টি ভাল দেখায় না হেতুই আউযুবিল্লাহর কদর। আউযুবিল্লাহর তেমন কোন গুরুত্ব কিম্বা অন্য কোন তাৎপর্য থাকতে পারে এ নিয়ে মাদ্রাসা পাস করা অনেক

www.pathagar.com

আলিম-উলামাও কখনো ভেবেছেন কিনা জানি না। ভাবাটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক,কারণ, দেশে বিরাজমান পরিবেশ-পরিস্থিতিতে মানুষের ব্যক্তিগত,পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ড যেভাবে তাৎপর্যহীন এবং প্রাণহীন আনুষ্ঠানিকতার সর্বগ্রাসী ছোবলে আবদ্ধ, সে ক্ষেত্রে কোন বিষয়ের তাৎপর্য কিম্বা গুরুত্ব সম্পর্কে ভাববার সময় সমাজের নেই। এক বেপরোয়া যান্ত্রিক গতি মানুষের মননশীলতাকে পঙ্গু করে দিয়েছে।

এমন একটি অবস্থায় মানুষের মননজগতের অনুশীলন-চর্চা একরূপ অবশ্যম্ভাবীই হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং পুনরায় নতুন করেই মানুষের মননজগতের বিকাশ এবং বিন্যাস ঘটাতে হবে,তা না হলে মানুষরূপী পশুদের দৌরাত্ম্য মানবতাকে এক অবর্ণনীয় দুর্ভোগ ও দুর্যোগের কবলে ঠিমি করে রাখবে যার কিছু কিছু আলামত ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। সৃষ্টির সেরা জীবের কোন কর্ম-কান্ডই নিছক তামাশার বিষয়বস্তু হতে পারে না। ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র কর্মকান্ডেরও তাৎপর্য এবং গুরুত্ব থাকা চাই। এই গুরুত্ব এবং তাৎপর্য সন্ধান করতে গিয়েই আমার মনে উদ্রেক ঘটে "আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম" সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা অব্যাহত রাখা।

(ঘ) আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম-এর শাব্দিক অর্থ, তাৎপর্য এবং গুরুত্ব

(আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম) এর অর্থ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। -"আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহ পাকের নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।" উক্ত অর্থের মধ্যে তিনটি সত্তার উল্লেখ আছে যথা 'আমি', 'শয়তান' এবং 'আল্লাহ পাক'। 'আমি ' অর্থাৎ মানুষ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন সূরায় ব্যাখ্যা রয়েছে।

মানুষ যইফ অর্থাৎ দুর্বল এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ নফসের খায়েশে পরিপূর্ণ লোভী সত্তা। পরনির্ভরশীলতা তার স্বাভাবিক স্বভাব। কাম, ক্রোধ,লোভ, ক্ষুধা, হিংসা, দ্বেষ তার আচরণে বিরাজমান। মানুষের পরিচয় এবং চরিত্র সম্পর্কে পবিত্র কোরআন মানুষকে সজাগ এবং সচেতন করেছে। মানুষের মধ্যে আল্লাহ রূহ বা পরম আত্মা ফুঁকে দিয়েছেন-"নাফাখ্তু ফীহি মিররূহী" অর্থাৎ কিনা আমার (আল্লাহর) রূহ থেকে রূহ আদমের মধ্যে ফুঁকে দিলাম।

মানুষের রূহ তাই পরম করুণাময় আল্লাহর নুরের অংশ। নফসের খায়েশ নিয়ন্ত্রণ করে ঐশীরূহের পবিত্রতা রক্ষা করার জন্যও মানুষকে পথ বাতলে দিয়েছেন আল্লাহ। মানুষকে নফসের দাস হতে নিষেধ করেছেন আল্লাহ। আল্লাহ প্রেরিত বিধানে মানুষের জন্য রয়েছে বিভিন্ন আদেশ-নির্দেশ এবং বাধা-নিষেধ। সেগুলো একান্ত মনে মেনে চললে মানুষ দুনিয়ার বুকে নিশ্চিত শান্তিতে বসবাস করতে সক্ষম হবে- সক্ষম হবে নিজেদেরকে অনেক পাপ থেকে মুক্ত রাখতে।

www.pathagar.com

এর পর পবিত্র কোরআনে **শয়তানের চরিত্র** এবং পরিচিতি সম্পর্কে বিভিন্ন সুরায় বিস্তারিত বিবরণও **দিয়েছেন। শয়তান আদম** (আঃ)–কে সিজদা না করে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছে **এবং আল্লাহর কাছ থেকে** বিতাড়িত এবং অভিশপ্ত হওয়ার পূর্বে আল্লাহর কাছ থেকেই **সীমিত শক্তি ভিক্ষে** করে এনেছে এই বলে যে, সে দুনিয়ার বুকে আল্লাহ প্রেরিত খলীফা **মানুষকে পদে পদে ধোকা দিবে**– মানুষকে বিভিন্ন লোভ–লালসা প্রদর্শন করে শয়তান **মানুষকে বিভিন্ন পাপাচারে জড়িয়ে ফেলবে।** শয়তান কখনও সুন্দরী বদ রমণীর বেশে, **কখনও ধন–দৌলত দখলে** আনার বেপরোয়া জেদ হিসেবে মানুষের মধ্যে ক্রিয়াশীল থেকে **মানুষকে হিংসা, দ্বেষ,** হানাহানি, সংঘাত এবং সংঘর্ষে লিপ্ত করেযাবে।

শয়তান মানুষকে প্রতারণা **শিখাবে, ক্ষমতা** এবং প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করার সীমাহীন লোভে স্বার্থান্ধ করে তুলবে। **কল্যাণমুখী, সৃজনমুখী** এবং স্রষ্টামুখী সকল কাজে শয়তান মানুষকে অনুৎসাহিত করবে। **মানুষকে প্রতিনিয়ত** অনুপ্রেরণা জোগাবে কেবল অকল্যাণকর, খোদাদ্রোহী এবং **ধ্বংসের কাজে লিপ্ত** হতে। অপরদিকে, পবিত্র কোরআনে আল্লাহর গুণাবলী এবং পরিচিতি **সম্পর্কে অসংখ্য** আয়াত রয়েছে। ইতিপূর্বেই মহান স্রষ্টার পরিচয় সম্পর্কে কিছু কথা **উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ** বা স্রষ্টা দৃশ্য এবং অদৃশ্য সকল কিছুরই একক স্রষ্টা। তিনি **সর্বশক্তিমান। তিনি** স্বনির্ভর। তিনি পরম করুণাময় এবং অযাচিত দানকারী। তিনি **অনন্ত এবং অসীম। তিনি** অব্যয়, অমর, অক্ষয় এবং অবিভাজ্য। তিনিই আদি এবং তিনিই **অনন্ত। এ ছাড়াও আল্লাহর** রয়েছে অবর্ণনীয় বৈশিষ্ট্য।

'মানুষ', 'শয়তান' এবং 'আল্লাহর' পরিচয় সম্পর্কে, চরিত্র সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর যে প্রশ্নটি অতি **স্বাভাবিকভাবেই মনে জাগরিত** হয় তা হল, দুনিয়ার বুকে চলার পথে তাহলে কার সাহায্যপ্রার্থী **হওয়া উচিত? মানুষ** কার সাথে ঐক্যজোট গড়ে তুলবে? বদ শয়তানের সংগে, না **পাক আল্লাহর সংগে? যার** সাহায্য নিলে নরকে জ্বলতে হবে, না যার সাহায্য নিলে **স্বর্গ বা জান্নাত পাওয়া** যাবে এবং জগতেও লাভ করা যাবে শান্তি তার সাথে হবে মানুষের ঐক্য। **না মানুষ কারো** সাহায্য ব্যতীতই একা জীবন পথে অগ্রসর হতে থাকবে? মানুষ একা চলতে পারে না, কারণ তার প্রকৃতিতে রয়েছে পরনির্ভরশীলতার বৈশিষ্ট্য। **তাই মানুষকে কারো** না কারো সাহায্য অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে।

মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংগে সংগেই সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুটিকে সম্পূর্ণভাবেই নির্ভরশীল হতে হয় পিতা–মাতা কিম্বা তাদের অবর্তমানে নিকটতম আত্মীয়–স্বজনের উপর। বয়স বৃদ্ধির সংগে সংগে **পরনির্ভরশীলতার** রূপ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ ধারণ করতেথাকে।

শিক্ষকের উপর নির্ভরশীলতা, **খেলার সাথী** এবং বন্ধু–বান্ধবদের উপর নির্ভরশীলতা; স্ত্রী এবং সন্তান–সন্ততির **উপর নির্ভরশীলতা;** রোগ মুক্তির জন্য ডাক্তার–কবিরাজ এবং

www.pathagar.com

পীর-ফকিরদের উপর নির্ভরশীলতা; জীবন চলার সাথে মানুষকে আরও বিভিন্নমুখী নির্ভরশীলতার আশ্রয় নিতে হয়। মানব জীবনের ইতিহাসই হচ্ছে যেন নির্ভরশীলতার ইতিহাস। মানুষ কোন অবস্থাতেই স্বাবলম্বী কিম্বা স্বনির্ভর নয়। এদিক থেকে মানুষ অন্যান্য জীব-জানোয়ারের তুলনায় অসহায়। অন্যান্য জীব-জানোয়ারের মানুষের মতন সুশৃঙ্খলিত পারিবারিক জীবন নেই, নেই শিক্ষা-জীবন; সামাজিক কিম্বা সাংস্কৃতিক জীবন, নেই ব্যবসায়িক কিম্বা রাজনৈতিক জীবন।

তাদের কাপড় পরতে হয় না; তাদের রান্না করতে হয় না; তাদেরকে প্রতারণার আশ্রয় নিতে হয় না; তাদেরকে ওয়াদাবদ্ধ কিম্বা কারো কাছে অঙ্গীকারা বদ্ধ হতে হয় না; তাদেরকে আইন-আদালতের আশ্রয় নিতে হয় না। জীব-জানোয়ার সে অর্থে স্বাধীন। কিন্তু সৃষ্টির সেরা মানুষের পরনির্ভরশীলতার যেন কোন শেষ নেই, রয়েছে কেবল শুরুর নির্দিষ্ট ইতিহাস। তাই স্বাভাবিকভাবেই মানুষ অন্যান্য জীব-জানোয়ারের মতন বেপরোয়া মুক্ত জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। মানুষকে জীবন পথে চলার জন্য সুযোগ্য অবলম্বন বেছে নিতেই হবে, বেছে নিতে হবে নির্ভরযোগ্য সহযোগী, নির্ভরযোগ্য উপাদান এবং সুনির্দিষ্ট বিধান। জঙ্গলবাসী জীব-জন্তুর মতন বাঁধনহারা মুক্ত জীবন মানুষের জন্য নয়। জন্মলগ্নে সৃষ্টির সেরা জীব মানুষকে সীমাহীন অসহায়ত্বে রেখে দিয়ে স্রষ্টা মানুষকে কেবল এ শিক্ষাই দিয়েছেন যে, সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুটির মতনই মানুষ স্রষ্টার কাছে সারাটি জীবন অসহায়ই থেকে যাবে, যদি না মানুষ স্রষ্টার প্রেরিত বিধান মতে জীবন রচনা করে। কেবল স্রষ্টার অনুগ্রহ লাভের মধ্য দিয়েই মানুষ স্বাবলম্বী হওয়ার পথে অগ্রসর হতে পারে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথাটি স্পষ্ট যে, মানুষ একা চলতে পারে না, তার নির্ভরযোগ্য অবলম্বন প্রয়োজন। তাহলে মানুষকে বাদ দিলে 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজিমের' মধ্যে অবশিষ্ট যে দুটি সত্তা থেকে যাচ্ছে তা হচ্ছে 'আল্লাহ' পাক বা স্রষ্টা এবং 'শয়তান'।

এই দু'টি সত্তার পরিচয় আমরা এখন জানি। পরিচয় এবং চরিত্র জেনেশুনে মানুষ তাহলে জীবন পথে চলার জন্য উপরোক্ত দুই সত্তার মধ্য থেকে কোন্ সত্তাকে বেছে নিলে নিশ্চিত শান্তিময় কল্যাণের পথে বিকাশলাভে সমর্থ হবে তা মানুষকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপরই নির্ভর করবে মানুষের জীবন কোন্ পথে বিকশিত হবে।

দৈনন্দিন জীবনে অহরহ আমরা প্রত্যক্ষ করছি দুর্বল কিম্বা অসচ্ছল ব্যক্তি সবল এবং সচ্ছল ব্যক্তির নৈকট্য লাভের জন্য ব্যাকুল থাকে। আকুতি-মিনতি করে হলেও সে সবল এবং সচ্ছল ব্যক্তির কৃপালাভের জন্য প্রতিনিয়ত ধরনা দিতে থাকে। এটা কোন অপরাধের কথা নয়। প্রকৃতিগতভাবেই দুর্বল সবলের আশ্রয়প্রার্থী হয়ে থাকে।

তাহলে, যিনি সৃষ্টিকুলের মহান স্রষ্টা, সৃষ্ট বিশ্বসহ মহা সৌরমন্ডলের প্রতিপালক, সর্বশক্তিমান, অযাচিত দানকারী, পাপ ক্ষমাকারী দুর্বল এবং নির্ভরশীল মানুষের জন্য

www.pathagar.com

একমাত্র তিনিই কী সর্বকালের নির্ভরযোগ্য অবলম্বন নন? সেই সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান স্রষ্টার আনুকূল্য, সন্তুষ্টি এবং নৈকট্যলাভের প্রত্যাশাই মানুষের পরম কামনার বস্তু হওয়া উচিত নয় কী?

অবশেষে, শয়তানের চরিত্র এবং পরিচয় সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর নিজ শান্তি বজায় এবং কল্যাণকর কর্মে লিপ্ত থাকার জন্য শয়তানের সাহায্য কিম্বা কৃপা গ্রহণ করার আর কোন প্রয়োজন মানুষের রয়েছে কী? শয়তানের বন্ধুত্বলাভের জন্য কোন বিশেষ সাধনার প্রয়োজন হয় না, কেবল আল্লাহর মনোনীত বিধান অমান্য করে চললেই শয়তান অত্যন্ত নিকটতম বন্ধু বেশে হাযির হয় মানুষের কাছে। আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য রয়েছে মানুষের জন্য রচিত আল্লাহরই মনোনীত বিধানের অনুসরণ, আর শয়তানের নৈকট্য লাভের জন্য পথ হয়েছে আল্লাহ্ মনোনীত বিধানেরই প্রত্যাখ্যান। শয়তানকে বন্ধু হিসেবে পাওয়া সহজ হলেও সে যেন পাওয়া নয়। সে যেন সব কিছু হারিয়ে নিজকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করা। সে অন্ধকূপে ষড় রিপুর ভোগ-লালসা মিটানোর জন্য চাকচিক্যময় সামগ্রী বিদ্যমান থাকতে পারে, সেখানে নেই 'রূহ' বা পরমাত্মার শান্তি। সে অন্ধকূপে স্ফূর্তি আছে, স্বস্তি নেই; ভোগ আছে, তৃপ্তি নেই; বন্ধন আছে, মুক্তি নেই; দুর্বল 'মানুষের দুর্বলতা বৃদ্ধির উপকরণ আছে, সবল রূপে বিকশিত হওয়ার রাস্তা নেই- নেই কোন সুযোগ।

এত কিছু জানার পরও মানুষ তাহলে কার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে- আল্লাহর সাথে, না আল্লাহ কর্তৃক বিতাড়িত এবং অভিশপ্ত শয়তানের সাথে? জীবনপথে চলার জন্য এই বন্ধুত্ব বা পথ বেছে নেয়ার অর্থই 'জীবন দর্শন' বেছে নেয়া নয় কী? মানুষ আল্লাহকে বেছে নিলে আল্লাহর মনোনীত বিধান পবিত্র কোরআন মোতাবেক তার জীবনের বিন্যাস এবং বিকাশ ঘটাতে থাকবে। পক্ষান্তরে, মানুষ শয়তানকে বেছে নিলে তার জীবনের বিন্যাস এবং বিকাশ হবে আল্লাহ মনোনীত বিধান বিরোধী, অর্থাৎ শয়তানী ছাঁচে এবং ধাঁচে গড়ে উঠবে জীবন তার।

দু'টি পথ এক নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন। একটি আল্লাহ প্রতিশ্রুত জাহান্নাম বা নরকের পথ, অপরটি 'জান্নাত' অর্থাৎ স্বর্গের পথ। এই দু'টি ভিন্ন পথে চলার ফলাফল পবিত্র কোরআনে অতি স্পষ্টভাবেই বিধৃত রয়েছে। স্রষ্টা মানুষকে স্বাধীন বিবেক দিয়েই সৃষ্টি করেছেন এবং সেই স্বাধীন বিবেকের সাহায্যেই মানুষকে স্রষ্টা পথ বেছে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। মানুষেরই নিজ শান্তি, স্বস্তি, কল্যাণ, প্রগতি এবং মুক্তির জন্য জীবন চলার পথ বেছে নিতে হবে এবং সঠিক 'ইলম' অর্জনের মধ্য দিয়ে শয়তানকে চিহ্নিত করতে হবে-জিহাদেও লিপ্ত হতে হবে। সুতরাং আমরা স্পষ্টতই দেখতে পাচ্ছি, যে, 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম' কেবল নিছক একটি পর্ব পালনের জন্য ব্যবহৃত রীতি বা আনুষ্ঠানিকতা নয়। এর অভ্যন্তরে রয়েছে মানুষের জন্য একটি পরিপূর্ণ দর্শন বেছে নেয়ার আহ্বান। উক্ত আয়াতটির তাৎপর্য এবং গুরুত্ব অনুধাবনে সমর্থ হলেই কেবল মানুষ উপকৃত হবে, খুঁজে পাবে তার জীবন দর্শনের রূপরেখা এবং উক্ত

www.pathagar.com

আয়াতটির আলোকে গৃহীত দর্শনের রূপরেখা বাস্তবায়নের জন্য আমাদের মাঝে রয়েছে স্রষ্টা বা আল্লাহরই মানোনীত বিধান পবিত্র কোরআন। এই বিধান অনুযায়ী যে সভ্যতা এবং প্রগতির ধারা রচিত হবে তার অর্থ এবং তাৎপর্য শয়তানের অনুসারী কর্তৃক রচিত সভ্যতা এবং প্রগতির অর্থ এবং তাৎপর্যের বিপরীত হবে।

প্রথমটি উন্নতি এবং কল্যাণধর্মী কর্ম তৎপরতার মধ্য দিয়ে স্রষ্টার নৈকট্য লাভের দিকে মানুষকে ধাবমান করবে, আর দ্বিতীয়টি লোভাতুর এবং ভোগী কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে মানুষকে এক যন্ত্রণাময় ধ্বংসের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে। সর্বশক্তিমান স্রষ্টার পরিচয় জানা সত্ত্বেও যারা শয়তানের বন্ধুত্ব কামনা করছে এবং শয়তানেরই অনুচর হয়ে সাময়িক ভোগ-লালসায় জীবনকে জড়িয়ে বসেছে, তারা যে স্বয়ং ইবলিস শয়তানের চেয়েও দু'কদম আগে বাড়িয়ে স্রষ্টাকে ভর্ৎসনা করবে এবং ধিক্কার দিবে এবং জগতে আল্লাহর বিধান অনুসারীদের বিদ্রূপ করে বেড়াবে, তাতে বিস্ময়ের আর কী-ই বা আছে? শয়তানের অনুসারীদের দ্বারা রচিত সভ্যতা এবং প্রগতির যাঁতাকলে আল্লাহর অনুসারীদেরকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নির্যাতন এবং দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হবে এটাই স্বাভাবিক। কারণ, আল্লাহর বিধান বাস্তবে অনুসারী এবং প্রয়োগকারীদের দ্বারা রচিত সভ্যতা এবং প্রগতির অভ্যন্তরেই কেবল মানবতাবোধ লালিত হতে পারে-শয়তানী পদ্ধতিতে গড়া সভ্যতা মানবতাকে শোষণ-জুলুম এবং নিষ্ঠুরতার দাবানলে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছাইভস্ম করে দিয়ে বিশ্বে মানুষের জন্য সৃষ্টি করে এক অসহনীয় নারকীয় পরিবেশ। স্রষ্টাত্যাগী বর্তমান বিশ্বের দু' পরাশক্তি আমেরিকা এবং রাশিয়া কর্তৃক বিশ্বের জনগণ এবং সম্পদের উপর নিজ নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার বেপরোয়া প্রতিযোগিতা ইতিমধ্যেই সেই নারকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে ফেলেছে যার আলামত আমাদের মত অনুন্নত দেশেও আজ অতি ভাস্বর। এ বিষয়ে পরাশক্তিদ্বয়ের মধ্যেও ইদানীং খানিকটা হলেও বোধোদয়ঘটেছে।

সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের নেতা মিখাইল গর্বাচেভ তো ইতিমধ্যেই তার নুতন ভাবনা সম্পর্কে 'পেরেস্ত্রোইকা ও কিছু নুতন ভাবনা' নামে একটি গ্রন্থও প্রকাশ করে ফেলেছেন। এহেন পরিস্থিতিতে মানুষের সুষ্ঠু রক্ষা, লালন এবং বিকাশের স্বার্থে "আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম"-এর গুরুত্ব অনুধাবন করা বর্তমান বিশ্বের জন্য যে কতো প্রয়োজন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বিশ্বের স্রষ্টা, বিশ্বের প্রতিপালক এবং সর্বশক্তিমান 'আল্লাহর' সাথে ঐক্য, না বিতাড়িত এবং অভিশপ্ত শয়তানের সাথে মানুষের ঐক্য এ বিষয়ে আর দ্বিধাদ্বন্দ্বের কোন অবকাশই থাকে না। মানব সভ্যতা ও প্রগতির ধারা সৃজনশীল এবং মানব কল্যাণমুখী তথা স্রষ্টামুখী করে নতুন ভাবে বিন্যাস ঘটানো বিশ্ব মানবতার অস্তিত্ব বহাল রাখার স্বার্থেই কার্যকরী করতে হবে। এ বিষয়ে গর্বাচেভের 'পেরস্ত্রোইকা' আল্লাহ পাকে বিশ্বাসীদের জন্য মোটেও কোন নতুন ভাবনা নয়। পবিত্র কোরআনই এর সাক্ষী।

www.pathagar.com

(ঙ) আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীমঃ পড়ার নির্দেশ কখন এবং কিভাবে নাযিল হয়েছেঃ

'আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম' পড়ার নির্দেশ কখন এবং কিভাবে অবতীর্ণ হয়েছে, সে সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই ধারণা স্বচ্ছ নয়। এখন পর্যন্ত এমনও অনেক মানুষ রয়েছে, যারা সমাজে ইসলাম-অনুসারী হিসেবে পরিচিত অথচ তাদেরও অনেকে আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীমের তাৎপর্য তো দূরের কথা এর শাব্দিক অর্থ পর্যন্ত জানে না কিম্বা জানার কোন প্রয়োজনও মনে করে না। ইসলাম-অনুসারীদের অত্যন্ত নগণ্য সংখ্যরই হয়ত বা উক্ত আয়াতটি নাযিল হওয়া সম্পর্কে কিছু ধ্যান-ধারণা রয়েছে। কিন্তু সে ধ্যান-ধারণারও তেমন কোন ব্যাপকতা নেই। তারা সাধারণভাবে মানুষকে কেবল এতটুকুই জানিয়েছেন যে, আল্লাহ তাঁর প্রিয় রাসুলকে নির্দেশ দিয়েছেন- "যখন আপনি কোরআন পাঠ করতে চান, তখন বিতাড়িত শয়তান (-এর অনিষ্ট) থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করুন। এমন ব্যাখ্যা আলিম-উলামা পবিত্র কোরআন থেকেই হুবহু গ্রহণ করেছেন। আবার অনেকে হাদীসেরও উধৃতি দিয়ে থাকেন। কারণ পবিত্র কোরআনে 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম' এমনভাবে কোন সূরায়ই আয়াত হিসেবে বিধৃতনেই।

পবিত্র কোনআনের সুরা "নাহল (পারাঃ ১৪ঃ আয়াত ৯৮ঃ মাআরেফুল কোরআনের ৪৪৬ পৃষ্টায়) যতটুকু পাওয়া যাচ্ছে, তাতে কেবল রয়েছেঃ

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

(ফাইযা ক্বারাতাল কোরআনা ফাস্তায়েয বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম)

অর্থাৎঃ "অতএব যখন আপনি কোরআন পাঠ করেন, তখন বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করুন।"

কোরআন তিলাওয়াত আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাযীম দিয়ে শুরু করার অর্থই হচ্ছে মানব জাতি কোরআন পাঠের মধ্য দিয়ে বুঝতে সক্ষম হবে যে, মানব জাতির সকল ধরনের কর্মকান্ড এবং সমগ্র জীবনের কর্মকান্ড পরিচালনা করার জন্যই আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে। কারণ আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত মানব জাতি যে এক মুহূর্তও বেঁচে থাকতে পারে না, সেই পরম সত্যটি আল্লাহর বিধান কোরআন পাঠ এবং তার অর্থ এবং তাৎপর্য অনুধাবন করার মধ্য দিয়েই মানব জাতি বুঝে নিতে সক্ষম হবে তার জীবন দর্শন। সৃষ্টজগত, সৃষ্টজগত সৃষ্টির রহস্য এবং স্রষ্টা সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি জ্ঞানই মানব জাতিকে বাত্লে দিবে যে, তার প্রকৃত বন্ধু, চিরসাথী এবং দয়ালু সাহায্যকারী কে হবে।

www.pathagar.com

মানব মনে একবার এ উপলব্ধির জন্ম হলেই তখন তারা আর বিপদগামী হবে না, হবে না শয়তানের বন্ধু কিম্বা অনুসারী। তখন সে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করবে যে, তার জীবনের প্রতি পদে এবং প্রতিটি কাজে আল্লাহর সাহায্য কামনা করা কতো জরুরী। সুতরাং আলোচ্য গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ বিচার করার পর কি করে মানব জাতি 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম পাঠ করার ক্ষেত্র সীমিতকরণ করার কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে? কারণ উক্ত আয়াতটি পাঠের ক্ষেত্র সীমিতকরণ করার অর্থই হবে, মানব জাতির নিজের অনিষ্ট নিজেই ডেকে আনার শামিল। তাই "আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম' জীবনের কোন বিশেষ একটি ঘটনা, পর্ব উদযাপনের জন্য বা মোকাবিলা করার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন এমনটি ভেবে নেয়া মোটেও যুক্তিযুক্ত নয়। উক্ত আয়াতটির মধ্যে মানবজাতির জন্য সুদূরপ্রসারী ইশারা অন্তর্নিহিত।

(চ) শেষ কথা

'আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম' সম্পর্কে শেষ কথায় এসে একথাই বলতে হচ্ছে যে, দুর্বল মানব জাতির পরনির্ভরশীল বৈশিষ্ট্যের কেবল একমাত্র আল্লাহর সাহায্য লাভের মধ্য দিয়েই অবসান ঘটতে পারে। আল্লাহর ইচ্ছা, মানব জাতি কেবল তার উপরই নির্ভরশীল হয়ে উঠুক। জগতের অন্য কোন বাহন মানব জাতির অভাবের বোঝা বইতে কেবল অক্ষমই নয়, অযোগ্যও বটে। শয়তান তো অযোগ্য বটেই।

তাই আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) মানব জাতিকে যে কোন কাজ শুরু করার পূর্বে 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম' পড়ার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। এ নির্দেশটি কেবল পবিত্র মনে করে মুখে উচ্চারণ করে গেলেই চলবে না, উক্ত নির্দেশের গভীর তাৎপর্য বরং গুরুত্ব অনুধাবনও করতে হবে।

'বিতাড়িত শয়তান হতে আমি আল্লাহর সাহায্য চাচ্ছি' একথা উচ্চারণ করার মানেই হচ্ছে, আমি আল্লাহর উপর নির্ভরশীল হচ্ছি এই ভেবে যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্রই কেবল শক্তি রয়েছে আমাকে অর্থাৎ মাবন জাতিকে শয়তানের কবল থেকে রক্ষা করার। মানুষের হিফাযতকারী কেবল স্রষ্টা নিজেই।

'আল্লাহর কাছে সাহায্য চাচ্ছি কেবল এ কথা উচ্চারণ করলেই চলবে না, কারণ আল্লাহর সাহায্য লাভের জন্য নিজেদেরকে উপযোগীও করে তুলতে হবে। দিন-রাত চব্বিশ ঘন্টা কেবল আল্লাহরই সাহায্য প্রার্থনা করে যাচ্ছি অথচ আল্লাহর সাহায্য লাভের জন্য যে কতগুলো শর্ত রয়েছে, রয়েছে কতগুলো মাধ্যম তার কোন কিছুরই আমি ধার ধারছিনে, কোন শর্তই আমি পূরণ করছিনে, কি করেই বা তাহলে আল্লাহ্র সাহায্য বর্ষিত হবে আমাদেরউপরে?

www.pathagar.com

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই তো আমরা এ সত্যটি পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হই। দৈনন্দিন জীবনে আমরা কারো সাহায্যপ্রার্থী হলেও তো সাহায্যদাতার নির্দিষ্ট কিছু শর্ত থাকে এবং সে শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে আমরা সাহায্য থেকে বঞ্চিত হই। সাহায্যকারী সাহায্যদানে ইচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও সাহায্য প্রার্থনাকারী যদি কোন শর্তই পূরণ করতে আগ্রহী না থাকে তেমন অবস্থায় সাহায্যকারী সাহায্যদানে অক্ষম থেকে যায়।

কোন মানুষের ঘরে কোন আগন্তুক এসে যদি কিছু দিন বসবাস করার জন্য আশ্রয় চেয়ে বসে সে অবস্থায়ও আশ্রয় প্রার্থনাকারীকে ঘরের মালিকের নির্দিষ্ট কিছু শর্ত মেনে চলার অঙ্গীকার করতে হয় এবং বাস্তবে তার প্রতিফলনও ঘটাতে হয়, তা না হলে আশ্রয়দানকারী আশ্রয়প্রার্থী আগন্তুককে তার ঘরে বসবাস করা তো দূরেরই কথা, ঘরে প্রবেশ করতে পর্যন্ত দিবে না। আশ্রয় অথবা সাহায্যদানের শর্তাবলী পূরণ না হলে প্রার্থনাকারী মুখে যতই অনুনয়-বিনয় করুক না কেন, তাতে তেমন কোনই ফল হয় না।

আল্লাহর সাহায্যলাভের ব্যাপারে এর ব্যতিক্রম হতে যাবে কেন? অযাচিত ভাবে যা যা দান করার সে সকল উপকরণ এবং উপাদান পরম করুণাময় আল্লাহ তো মানব জাতিকে দান করেই রেখেছেন। এর পর মানব জাতির অন্য কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলেও আল্লাহর কাছে সে অনায়াসে এবং বিনা দ্বিধায়ই প্রার্থনা করতে পারে। আল্লাহর সাহায্যের দুয়ার তো মানব জাতির জন্য সদাই খোলা রয়েছে। কিন্তু সে চাওয়ার জন্য রয়েছে নির্দিষ্ট কিছু মাধ্যম বা প্রক্রিয়া এবং পাওয়ার জন্য রয়েছে কতিপয় অবশ্য পালনীয় শর্ত, যা আল্লাহ তাঁর মনোনীত বিধান পবিত্র কোরআনে বিধৃত করে দিয়েছেন। সেই চাওয়ার মাধ্যম বা প্রক্রিয়ার অনুগত না হওয়া এবং পাওয়ার শর্তগুলো তাচ্ছিল্যের সাথে উপেক্ষা অথবা অমান্য করার মধ্য দিয়ে প্রার্থনাকারী নিজের সকল সাহায্যের দ্বার মূলত বন্ধ করে দেয়।

'আমি বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি এর অর্থ হচ্ছে, আমি আল্লাহর উপর আমার নির্ভরশীলতা স্থাপন করছি। কেবল মুখের বাক্য দিয়ে এই নির্ভরশীলতা স্থাপন করা যায় না। বাক্য উচ্চারণের মধ্য দিয়ে থাকব আল্লাহর সাথে, আর প্রতিটি কর্মকান্ডে হব শয়তানের উপর আস্থাশীল, তাহলে তো আর আল্লাহর সাহায্য লাভের কোন প্রত্যাশাই করা উচিত নয়।

আল্লাহর উপর নিজের নির্ভরশীলতা স্থাপন করার ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথেই প্রতিটি কর্মকান্ডে আল্লাহর উপরই আস্থাশীল থাকতে হবে, মানব জাতির যে সকল কর্মকান্ডে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন বলে তাঁর প্রেরিত বিধানে বর্ণিত রয়েছে মানব জাতিকে কেবল সে সকল কর্মকান্ডেই লিপ্ত থাকতে হবে এবং এমনটা হলে আল্লাহ তাঁর ঘোষিত প্রতিশ্রুতি কার্যকর করতে বাধ্য অর্থাৎ তিনি তখন মানব জাতির উপর সাহায্য বর্ষণ করার ওয়াদা থেকে এক চুল পরিমাণও বিচ্যুত হবেন না। কারণ আল্লাহর সকল ওয়াদা সত্য।

www.pathagar.com

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ মানব জাতিকে নির্দেশ দিয়েছেন, "তোমরা আমার রজ্জু শক্ত করে ধরে রাখ" অর্থাৎ কিনা, তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও। আর আমরা মানব জাতি মুখে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করে বাস্তবে শত শয়তানের রজ্জু আঁকড়ে ধরে রাখি, যার ফলে ঐক্যের পরিবর্তে শতধা বিভক্ত হয়ে পড়ি।

মানব জাতির এহেন আচরণকে শিশুসুলভ হিসেবে মোটেও আখ্যায়িত করা যায় না। এ আচরণকে সত্য এবং ন্যায় থেকে নিজেদেরকে নির্বাসিত করে অসত্য এবং অন্যায়ের আবর্তে নিক্ষেপ করার স্বেচ্ছাচারী বাসনা হিসেবেই চিহ্নিত করার দাবী রাখে। নিজেদেরকে স্বেচ্ছাচারী সাজিয়ে কেবল মুখে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করার মধ্য দিয়ে মানুষ মানুষকে ধোকা দিতে সক্ষম হলেও আল্লাহর বিচারে তারা শয়তানেরই চেলা হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। বর্তমান বিশ্বের মানব জাতির অধিকাংশই উপরোক্ত স্তরের অন্তর্ভুক্ত।

বর্তমান বিশ্বে বস্তুভিত্তিক সভ্যতার তোড়জোড়। এ সভ্যতায় মানুষ নানান কৌশল–অপকৌশল অবলম্বনের মধ্য দিয়ে নিজেদের আসল চরিত্র ও চেহারা লুকিয়ে প্রকাশ্যে সাধু–সজ্জন–এর রূপ পরিগ্রহ করে। এহেন ধাঁধায় আসল–নকল চেনাই দায়।

তবে এই বস্তুভিত্তিক সভ্যতার জগদ্দল পাথরের নীচে আল্লাহর পবিত্র বিধান কোরআনের শিক্ষা যে একেবারেই চাপা পড়ে গেছে তা ঠিক নয়। মানুষের অভ্যন্তরে প্রোথিত আল্লাহর প্রদত্ত 'কুল্‌ব' বা 'রূহ' যেহেতু অবিনশ্বর, সেহেতু দুনিয়ার কোন বোঝাই কুল্‌বের প্রকৃত সিফত পরিবর্তন করার সাধ্য রাখে না। তবে কুল্‌বের জ্যোতি মানুষের স্রষ্টা বিরোধী কর্মকান্ড অব্যাহত রাখার মধ্য দিয়ে সাময়িকভাবে নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। এ কারণেই নিছক বস্তুভিত্তিক সভ্যতা মানুষকে আত্মিক দিক থেকে কাঙাল করে ফেলেছে। আত্মার এই কাঙালপনা নিয়ে মানব জাতি তার সৃজনশীল সুকুমারবৃত্তিগুলোর আর কোন তাৎপর্যপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হবে না। বস্তুর বিকাশধারাকে যদি আত্মিক সাধনার সাথে সমন্বিত না করা হয়, তাহলে বস্তুভিত্তিক সভ্যতার বিনাশ হয়ে পড়বে অনিবার্য। বস্তু ভিত্তিক সভ্যতার অতীত বিকাশের স্তরসমূহকে 'আস্তিকবাদের' আওতাভুক্ত করা যেহেতু আর কোন মতেই সম্ভব নয়, সেহেতু বিরাজমান বস্তুভিত্তিক সভ্যতাকে 'আস্তিকবাদের' আলোকে নবরূপে উজ্জীবিত করার সুযোগ এখনও বিদ্যমান। বস্তুর বিকাশ এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়নের ধারাকে একই স্রোতে রূপান্তরিত করতে সক্ষম না হলে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত 'লূত', 'আদ' এবং 'সামুদ' জাতির ধ্বংসের মতন বর্তমান সভ্যতাও আকস্মিক ধ্বংসের সম্মুখীন হয়ে পড়তে পারে। মানব সভ্যতার এহেন টলটলায়মান অবস্থায় পুনরায় স্রষ্টার উপরে গভীর বিশ্বাস স্থাপন করে "আউযুবিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীমের" ভিত্তিতে মানব জীবন দর্শন পুনঃ নির্মাণ করা এবং সেই অনুসারে সভ্যতার ও প্রগতির নতুন বিন্যাস সাধন করা অনিবার্য হয়ে পড়েছে। সমগ্র মানব জাতির সর্বাঙ্গীণ শান্তি ও কল্যাণময় ভবিষ্যতের স্বার্থেই আলোচ্য "আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম' থেকে নিঃসৃত দৃষ্টিভঙ্গি হয়ে উঠুক মানব জাতির বাস্তব জীবন–দর্শন। বিতাড়িত

www.pathagar.com

এবং অভিশপ্ত শয়তানের পথে নয়, পরম করুণাময় আল্লাহ বা স্রষ্টা মনোনীত পথেই শুরু হোক মানব জাতির নবযাত্রা। বিশ্বে শয়তানের অবস্থান রয়েছে বলেই মানব জাতির প্রয়োজন আল্লাহর সাহায্য এবং সে কারণেই আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছেন তাঁরই প্রণীত বিধান পবিত্র কোরআনে।

আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের অধিকাংশ সুরার মধ্যেই মানুষকে চিন্তাশীল হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন, তাগিদ দিয়েছেন 'ইলম' বা জ্ঞান হাসিলের জন্য। কারণ ইলম অর্জন ব্যতীত কোন জিনিসের তাৎপর্য বা গুরুত্ব অনুধাবন করা সহজ নয়। 'ইলম' এমন এক মহা মূল্যবান হাতিয়ার যা অন্যায় এবং অসত্যকে বশীভূত করে নিজস্ব গুণে।

উদারহণ স্বরূপ, উপস্থিত দশজন ব্যক্তির সম্মুখে হঠাৎ করে একটি সর্প এসে পড়লে সকলেই হয়ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে দৌড়ে পালাবে, কিন্তু উপস্থিত ঐ দশজনের মধ্যে কোন সাপুড়ে থাকলে সে প্রাণের ভয়ে দৌড়াবে না, বরং তার 'ইলম' দ্বারা সর্পটিকে সে বশীভূত করার আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। তেমনি ধরুন একটি শিকারী কুকুরের কথা। কোন শিকারের গন্ধ তার নাকে একবার ধরা পড়লেই হলো। তার চোখের ঘুম, বিশ্রাম, খানাপিনা হারাম হয়ে যাবে। মাটিতে নাক স্পর্শ করে করে শিকারী কুকুরটি পাগলের মত দৌড়তে থাকবে। এ সময় তার অন্য কোন হুশই থাকবে না। এ সময়ে তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখলেও সে উন্মাদের মত দাপাদাপি করবে শিকলমুক্ত হয়ে শিকারকে খুঁজে বের করার জন্য। পথি মধ্যে তার জন্য লোভনীয় প্রিয় খাদ্য ফেলে রাখলেও সে তার কোন তোয়াক্কাই করবে না। যে গর্তে বা ঝোঁপ-ঝাড়ে তার লক্ষ্যের বস্তু লুকিয়ে রয়েছে, তার সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত শিকারী কুকুরটির আর শান্তি বা স্বস্তি ফিরে আসেনা।
ঠিক অনুরূপ ভাবে যে ব্যক্তি একবার পরম করুণাময় স্রষ্টার পরিচয় পেয়েছে এবং 'ইলম' তাকে সাহায্য করেছে স্রষ্টার সঠিক পরিচয় পেতে, তখন তারও বিশ্রাম, ঘুম, আরাম-আয়েশ, খানাপিনা, সন্তান-সন্ততি কোন কিছুই তাকে বশীভূত করে রাখতে পারবে না। সকল ভোগ সামগ্রীই তার কাছে অপ্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়ায়।

কোন বাধাই তখন তার পথ রোধ করতে পারবে না। সে ঐ শিকারী কুকুরের ন্যায় উন্মাদের মতনই আল্লাহর নৈকট্যে পৌছার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠবে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করাই হয়ে উঠবে তার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। 'ইলম'-এর ধর্মই হচ্ছে সন্ধানে লিপ্ত হওয়া-মূল ইপ্সিত বস্তুর নিকট পৌছার জন্য প্রতিনিয়ত ছুটে বেড়ানো। এই ইলম হাসিল করার জন্যই সর্বাগ্রে চিন্তাশীল হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

'আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম' থেকে শুরু করে পবিত্র কোরআনের শেষ পর্যন্ত চিন্তা, গবেষণা এবং প্রতিনিয়ত সাধনার সংগে অনুসন্ধান কার্য অব্যাহত রাখতে সক্ষম হলে কোরআন আমাদের কাছে এক অফুরন্ত মহা মূল্যবান খনির মতনই ধরা দিবে। আর তা নাহলে মুখে আমরা কেবল ফাঁকা দাবী করতেই থাকব-'কোরআনই মুক্তির সনদ',

www.pathagar.com

'কোরআনই একমাত্র শান্তির পথ', 'কোরআনই পূর্ণাঙ্গ দর্শন' ইত্যাদি ইত্যাদি। এমন ফাঁকা দাবী আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনই পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে না। মুখে আল্লাহর সাহায্যপ্রার্থী হয়েও আমরা ইল্‌মের অভাবে আল্লাহর শর্তপূরণে ব্যর্থই থেকে যাব, বঞ্চিত হবো আল্লাহ থেকে 'কাংখিত' সেই সাহায্য এবং অনুগ্রহ অর্জন করতে। ইল্‌মহীন সাধনা বা প্রার্থনা ভক্তির রসে আপ্লুত থাকলেও কাংখিত বস্তু পেতে কখনই সাহায্য করবে না। তাই 'ইলম' অর্জনের প্রয়োজনীয়তাই আজ সর্বাধিক এবং সে কারণেই আমাদের সকলকে 'আউযুবিল্লাহ' থেকে পুনরায় শুরু করতে হবে।

কারণ 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম' আমাদেরকে যে জীবন দর্শন গ্রহণ করার ইংগিত প্রদান করে, সেই জীবন দর্শন অনুসরণ করা ব্যতীত জীবনের বিরাজমান দৃষ্টিভংগি কোনক্রমেই পাল্টাতে পারে না, জীবন কোন ক্রমেই শয়তানের প্রভাব থেকেও তাই মুক্ত হতে পারে না। তাই "আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম নিঃসন্দেহে সর্বকালের মানুষের জন্যই একটি স্থায়ী জীবন দর্শন হিসেবে গৃহীত এবং অনুকরণযোগ্য জীবন দর্শন হওয়ার দাবী রাখে বলে আমার সুচিন্তিত অভিমত।

এ প্রসঙ্গে আরও একটি উদাহরণ দেয়ার লোভ সামলাতে পারিছনে। যেমন ধরুন– বৈজ্ঞানিকরা যদি "বস্তুই গতি", "বস্তুই মুক্তির পথ", "বস্তুই প্রগতির মূল" বলে শতবর্ষ ধরে কেবল ঐ ধরনের ফাঁকা শ্লোগানের মধ্যে নিজেদেরকে আটকে রাখতেন, তাহলে 'বস্তুকে' কেউই চিনত না।

না, সে ধরনের ফাঁকা শ্লোগানের মধ্যে তারা নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ না রেখে আরো আরো ইলম বা জ্ঞান সাধনার মধ্য দিয়ে প্রতিনিয়ত নিষ্ঠার সাথেই 'বস্তুর' বিশ্লেষণ, বস্তুর উপর অনুসন্ধানকার্য অব্যাহত রেখে বস্তুকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটানোর সামগ্রী এবং উপকরণ হিসেবে রূপান্তরিত করেছেন। বস্তুই যে গতি এবং সভ্যতা তারা মানুষের চলার বাহন–মোটর গাড়ী, সামুদ্রিক জাহাজ, উড়োজাহাজ তৈরি করে তা দেখিয়েছেন। দূর দেশের সংবাদ শোনা, ছবিসহ সংবাদ শোনা এবং দেখার জন্য তারা রেডিও এবং টেলিভিশন তৈরি করেছেন। গরম থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বৈদ্যুতিক পাখা, এয়ারকন্ডিশনার ইত্যাদি তৈরি করেছেন। এরকম অসংখ্য সামগ্রী আবিষ্কারের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিকরা 'বস্তুর' উপর সদা অনুসন্ধানকার্য অব্যাহত রাখার মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনকে নানানভাবে সহজ এবং উপভোগ্য করে তুলেছেন। বস্তুভিত্তিক 'ইলম' অর্জন এবং তার প্রতিনিয়ত চর্চার মধ্য দিয়েই অনেক কিছু আবিষ্কার করেছেন বৈজ্ঞানিকরা। মানুষের চরিত্রে রয়েছে স্বার্থপরতা এবং সমস্যার প্রাধান্য। সুতরাং অতি স্বাভাবিকভাবেই তার লোভাতুর মন সমস্যা বিজড়িত মানসিকতা সহকারে বিজ্ঞানলব্ধ ফসল ভোগের প্রতিই অতি মাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানীরা স্রষ্টায় বিশ্বাসী, না অবিশ্বাসী, সে দিকটি মানুষের বিচার–বিশ্লেষণেরই বাইরে থেকে যায়। বিজ্ঞানলব্ধ ফসল ভোগের সাময়িক আনন্দ–উচ্ছ্বাসই মানুষের বিবেককে করে রাখে আচ্ছন্ন।

এই বিজ্ঞানীরাই যদি মানুষের কোন বাস্তব সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হত, কিম্বা বাস্তব সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে বের করার কোন উদ্যোগ না নিয়ে কেবল 'বস্তু' 'বস্তু' করে

www.pathagar.com

গগনবিদারী চিৎকার করে বেড়াত, তাহলে মানুষ বস্তু সম্পর্কে থাকত সম্পূর্ণই উদাসীন এবং অনাগ্রহী। যেমন অধিকাংশ মানুষই আল্লাহর পবিত্র বিধান কোরআন সম্পর্কে রয়েছে উদাসীন এবং অনাগ্রহী, কারণ আলিম–উলামার কাছ থেকে মানুষ কেবল জানতে পায় 'কোরআন আল্লাহর পবিত্র বিধান', 'সকল জ্ঞানের জ্ঞানই হচ্ছে কোরআন'। 'কোরআনই মুক্তির পথ ইত্যাদি উপদেশসমূহ, যা সাধারণ মানুষের কাছে থেকে যায় হেঁয়ালিপূর্ণ এবং দুর্বোধ্য। স্রষ্টার বিধান কোরআনই যে বিশ্বে বিরাজমান বস্তু জগত সম্পর্কে, বস্তুর ব্যবহার সম্পর্কে মানুষকে 'ইলম' হাসিল করার জন্য বার বার তাগিদ দিচ্ছে তা মানুষ উপলব্ধি করতে অক্ষমই থেকে যায়। স্রষ্টারই সৃষ্ট এ বস্তুজগত এবং এ বস্তু জগতের বিকাশ ঘটানোর প্রয়োজন রয়েছে মানুষেরই স্বার্থে এবং বস্তুর বিকাশ কেবল ইল্‌ম দ্বারাই সম্ভব, সে কথার স্পষ্ট ইংগিত এবং নির্দেশ ও রয়েছে কোরআনে।

সুতরাং কোরআন বস্ত–বিকাশের বিরোধী কোন বিধান যে নয় এ সত্যটি পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

তবে এই বস্তুর বিকাশ যদি স্রষ্টায় বিরোধী বা স্রষ্টার অবিশ্বাসীদের মাধ্যমে ঘটে, সেক্ষেত্রে বিকশিত ফসলের অপব্যবহার কিম্বা অকল্যাণকরভাবে ব্যবহৃত হওয়ার আশংকা থেকে যায়।

অপরদিকে, বস্তুর বিকাশ যদি স্রষ্টায় বিশ্বাসীদের মাধ্যমে ঘটে, সে ক্ষেত্রে বিকশিত ফসল সমগ্র মানবতার মঙ্গল, কল্যাণ এবং উত্তরোত্তর প্রগতির জন্যই ব্যবহৃত হবে। স্রষ্টায় বিশ্বাসীদের ইলমের মাধ্যমেই বস্তুজগতের বিকাশ ঘটুক এটাই স্রষ্টার ইচ্ছা এবং এ ইচ্ছাটি বাস্তবায়ন করার জন্যই কেবল আল্লাহ বা স্রষ্টা তাঁর পবিত্র বিধান কোরআনকে সমগ্র মানবতার জন্য বিশেষ নিয়ামত হিসেবে নাযিল করেছেন।

আর তাই তো আল্লাহ তাঁর বিশেষ দোস্ত আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)–এর কাছে তাঁর ইচ্ছা বাস্তবায়নের জন্য প্রেরণ করেছেন পবিত্র কোরআন এবং সেই কোরআন পাঠের পূর্বে হুশিয়ার করে দিয়েছেন এই বলে "ফাইযা ক্বারাতাল কুরআনা ফা'স্তাইয্ বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম।"
তাঁরই সাহায্য বা আশ্রয় চাওয়ার জন্য উক্ত আয়াতের মাধ্যমে দিয়েছেন স্পষ্ট নির্দেশ এবং প্রিয় নবীর (সঃ) ভাষায় আয়াতটি যে রূপ পরিগ্রহ করেছে তা হচ্ছে–" আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম।"

আজ আল্লাহ পাকে বিশ্বাসীদের জন্য সর্বাধিক প্রয়োজন ঐ সকল বিজ্ঞানীর মতই কিছু বিজ্ঞানী, যারা শুধুমাত্র বস্তুকেই নয়, আল্লাহর বিধান পবিত্র কোরআনের বিশ্লেষক, গবেষক এবং আবিষ্কারকরূপী বিজ্ঞানী হিসেবে কোরআনের 'ইলম' দ্বারা অর্জিত ফসল বস্তুভিত্তিক বিজ্ঞানজাত ফসলেরই ন্যায় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার নিরসন করবে। কেবল 'বস্তু–বিজ্ঞানী নয়, বিশ্ব অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আজ প্রয়োজন 'কোরআন–

www.pathagar.com

বিজ্ঞানী' যারা কোরআন ভিত্তিক সত্য, তত্ত্ব, তথ্যেরই আলোকে সমাধানের সকল সক্রিয় প্রয়াস নিতে সক্ষম হবে এবং কোরআন ভিত্তিক জীবনকে করে তুলবে সর্ব সাধারণের জন্য আকর্ষণীয় এবং উপকারী।

অতএব, বিশ্বমানবতার অস্তিত্ব, সভ্যতা, প্রগতি রক্ষার প্রয়োজনেই আজ আর কেবল 'বস্তু-বিজ্ঞানী' নয়, তার চেয়েও অধিক প্রয়োজন 'কোরআন-বিজ্ঞানী।' কোরআন সকল বিজ্ঞানেরই বিজ্ঞান, সুতরাং কোরআন-বিজ্ঞানী ব্যতীত কারই বা সাধ্য রয়েছে ঐ মহা বিজ্ঞানের রহস্য উদ্‌ঘাটন করা?

www.pathagar.com

২। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব কেন

অধুনা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নানান ধরনের আন্দোলন চলছে। অধিকার আদায়ের আন্দোলন, নারীমুক্তি আন্দোলন, সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলনসহ আরো বহু ধরনেরই আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে।

বর্তমান সভ্যতার ধারক–বাহক হিসেবে পরিচিত ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও প্রতিনিয়ত গণবিক্ষোভ ধূমায়িত হতে দেখা যাচ্ছে। কেন এত বিক্ষোভ? এককালে যেসব সমাজ ব্যবস্থা শান্তি, প্রগতি এবং সাম্যের দাবী নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল আজ তাদেরই অভ্যন্তরে নতুন করে শান্তি–প্রগতির দাবীতে গণ–বিক্ষোভ বিস্ময়কর নয় কী?

তাহলে কি বিশ্বের মানুষ এত অল্প সময়ে উপরোক্ত সমাজ ব্যবস্থা দুটোর উপরে নাখোশ হয়ে পড়েছে? আলোচিত সমাজ–ব্যবস্থা দুটো তাহলে কি মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে? নাকি ধনতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাদ্বয়ের আওতায় মানুষের মুক্তি অর্জন আদৌ সম্ভব নয়? সম্ভবই যদি হত, তাহলে ঐ সকল সমাজ ব্যবস্থার পক্ষে এতো ঢাক–ঢোল পেটানোর পরও ওখানকার মানুষ পুনরায় কেন শুরু করেছে অধিকার আদায়ের সংগ্রাম?

বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপ এবং স্বয়ং আমেরিকার বুকে কেন এতো আন্দোলন– কেন এতো বিক্ষোভ?

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশে সাম্য, মৈত্রী এবং ভ্রাতৃত্বের যে যুগান্তকারী রেনেসাঁ ইউরোপসহ সমগ্র পশ্চিমা জগতকে কাঁপিয়ে তুলেছিল এবং ইউরোপীয় দেশ ও জাতিসমূহকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে জনগণের জন্য সুখ, শান্তি, প্রগতি ইত্যাদি নিশ্চিতকরণে বিপুলভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল, সেই রেনেসাঁ সৃষ্টিকারী দেশ ও জাতিসমূহের মধ্যেও আজ কেন অধিকার আদায়ের আর্তি? আজ কেন সেখানে মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে গগনবিদারী চিৎকার?

দু' দু'টি জাঁদরেল সমাজ ব্যবস্থার অধীনে বসবাসরত মানুষের সুখ–শান্তির তো কোন সীমা থাকারই কথা ছিল না, কিন্তু সেখানে আজো কেন মুক্তির বাসনা গণবিস্ফোরণের রূপ নিচ্ছে? অর্থনৈতিক প্রাচুর্য এবং প্রচুর পরিমাণে ভোগ–বিলাসের উপকরণ মওজুদ থাকা সত্ত্বেও মানুষ কেনই বা সেখানে আত্মার শান্তি পাচ্ছে না?

বিশ্বের বুকে পরাশক্তি নামধারী দু'টি দেশের অভ্যন্তরে কেনই বা এতো অসন্তোষ? এ কিসের আলামত? পরাশক্তির অধিকারী হয়েও কেনই বা মানুষের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে তারা? তাহলে তাদের ঐ পরাশক্তি অর্জন কি মানুষের সুখ–শান্তি এবং বাসনা–

www.pathagar.com

কামনা পূরণের জন্য নয়? তাদের পরাশক্তি হওয়াটা কি তাহলে ভিন্ন কোন স্বার্থ বা অভিলাষ পূরণের লক্ষ্যেই কেবল?

যে শক্তি মানুষের সুখ-শান্তি, অধিকার, মর্যাদা এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ, মানুষ বা মানুষ পরিচালিত রাষ্ট্র তেমন শক্তি তাহলে কেনই বা অর্জন করতে চায়? আর কতকাল মানুষ ঐ নিরর্থক শক্তি জন্ম দেয়ার জন্য রক্ত ঝরিয়ে চলবে?

গণমানুষের আন্দোলন-উৎসারিত শক্তি যদি সেই গণমানুষেরই মান-মর্যাদা বৃদ্ধির কাজে না লাগে, তাহলে তেমন শক্তির তাৎপর্যই বা কি? গোষ্ঠী বিশেষের খেয়াল-খুশী কিম্বা কোন রঙিন অভিলাষ পূরণের লক্ষ্যে মানবতা বিলীন হতে যাবে কোন্ যুক্তিতে? এই প্রশ্নটির রহস্য অনুসন্ধানের মধ্য দিয়েই মানুষকে খুঁজে বের করতে হবে মুক্তির সত্যিকারের পথ ও পন্থা।

(ক) মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব কেন?

'মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব' এ কথা আশৈশব শুনে আসছি। কিন্তু কেন? এ প্রশ্নটিও আমার মনে জেগেছে আশৈশব। বয়স এবং কিছু কিছু অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব কিভাবে হল, সে তথ্য উদঘাটন করার জন্য আমার ঔৎসুক্য ক্রমবর্ধমান হারেই বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষ নামের এই জীবটির আচার-আচরণ, হাব-ভাব, প্রত্যক্ষ করে করে মানুষই যে সৃষ্টির সেরা জীব, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ উত্তরোত্তরই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারণ জীবনের প্রতি পলে পলে এবং চলার প্রতিটি পদে পদে আমি মানুষ নামক সৃষ্টির সেরা জীবটিকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছি, তবু পাচ্ছিনে তার সন্ধান। যাদের পাচ্ছি, তাদেরকে মূলত আমি দু'ভাগে বিভক্ত দেখছি। এর প্রথমটি হচ্ছে লোভী, ভোগী এবং বিত্তশালী উঁচু তলার মানুষ হিসেবে আমাদের কাছে পরিচিত। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে গরীব, অর্থ-প্রতাপহীন, নিতান্তই পর-করুণা নির্ভরশীল নীচ তলার মানুষ।

উপর তলার মানুষ অভিজাত, অহংকারী এবং বদরাগী এবং তারা নীচ তলার মানুষদেরকে সাধারণত কাণ্ডজ্ঞানহীন এবং কতকটা জংলী বলেও মনে করে। আর নীচ তলার মানুষ অবদমিত, দাসসুলভ, বিনয়ী এবং ভীত-সন্ত্রস্ত। উপরের তলার মানুষদেরকে তারা নির্দয় এবং স্বার্থপর মনে করে।

আলোচিত উভয় স্তরের মানুষদেরকেই আমি খুব কাছে থেকে দেখেছি, তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ হয়েও জীবন যাপন করার সুযোগ পেয়েছি। আলোচিত স্তরদ্বয়ের বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখলে এদের মধ্যে আমি সৃষ্টির সেরা জীব সেই মানুষকে তো খুঁজে পাচ্ছিনে। এদের কাউকেই সৃষ্টির সেরা কোন যুক্তিতেই বলা চলে না। এরা-আমরা সবাই মানুষ নামক একটা জীব বটে, তবে সেরা জীব যে নয়-এখন পর্যন্ত অন্তত নয় একথা আমি

www.pathagar.com

জোর দিয়েই বলতে পারি। তবে মানুষ নামক বর্তমান জীবটি সংখ্যায় সব কিছুর তুলনায়ই ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সৃষ্টির সেরা নামক মানুষ আদৌ তার মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে না। এমন কেন হল? তাহলে মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব বলা হলই বা এটা তো কোন মানুষের দেয়া ঘোষণা নয়। জানা মতে এবং নিশ্চিতভাবেই এ ঘোষণা তো স্বয়ং স্রষ্টারই ঘোষণা। স্বয়ং স্রষ্টা কি তাহলে হিসেবে কোনরূপ ত্রুটি (নাউযুবিল্লাহ) করেছেন? স্রষ্টার ত্রুটির তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। এ বিশ্বে স্রষ্টা একমাত্র ত্রুটিহীন সত্তা। যেহেতু ঘোষণাটি স্বয়ং স্রষ্টা বা আল্লাহ কর্তৃক, সেহেতু ঘোষণাটিও সম্পূর্ণ সত্য এবং যথার্থ। তাহলে কোথায় গেল আল্লাহ ঘোষিত সেই শ্রেষ্ঠ জীব যে সকল সৃষ্টির সেরা? সেই আল্লাহ্ ঘোষিত মানুষের জন্যই যেহেতু এই বিশ্ব সৃষ্টি, সেহেতু সেই মানুষ তো এই বিরাজমান বিশ্বেরই বাসিন্দা হবে। আল্লাহ ঘোষিত সৃষ্টির সেরা সেই মানুষ তাহলে হারিয়ে গেল কি? না সে মানুষ আজো জন্মায়নি আদৌ?

এমন ধারণা সত্য না হলেও মানুষ নামক বর্তমান জীবটির আচার-আচরণ থেকে সাধারণত এমন ধারণাই সৃষ্টি হয় আমাদের মনে। বিশেষ এক অণুবীক্ষণের মাধ্যমে আজ সেই মানুষ সন্ধানের প্রত্যয় নিয়ে আসুন না এগিয়ে চলি। সৃষ্টির সেরা জীব মানুষকে খুঁজে পাচ্ছিনে বলে যে মন্তব্য আমি এখানে করেছি, তা সাধারণ বিচারে কতকটা ঔদ্ধত্যপূর্ণ, ক্ষমাহীন এবং শাস্তিযোগ্য একটি অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে- হোক তাই-ই। তবু সত্য কথাটি সাহসের সাথে বলার গৌরব থেকে আমি নিজকে বঞ্চিত করতে প্রস্তুত নই। আমি যে মন্তব্য এখানে মানুষ সম্পর্কে রেখেছি বিরাজমান সমাজের মানুষ আমার বর্ণনা থেকে যদি উন্নততর হয়ে থাকে, তাহলে তা কেবল সৌভাগ্যেরই কথা নয়, গর্বের ধনও বটে।

তবে, আমি যখন দেখি স্বৈর, সবল ব্যক্তিকে দুর্বলের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে; আমি যখন দেখি কামাতুর বিত্তশালীকে বিত্তহীন ঘরের কুমারী মেয়ের ইজ্জত হরণ করতে; আমি যখন দেখি ওষুধের দোকানের সম্মুখেই অসহায় রুগ্ন বিধবা মা-কে বিনা ওষুধে ধুঁকে ধুঁকে মরতে; আমি যখন দেখি দেশদ্রোহী শাসকেরই নির্দেশে দেশপ্রেমিক নির্দোষ যুবককে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলতে, তখন আল্লাহর ঘোষিত সৃষ্টির সেরা জীব সেই 'মানুষ'কে আমি খুঁজে পাই না তাদের মাঝে। আমি খুঁজে পাই নিকৃষ্ট জীবের প্রেতাত্মা- ধ্বংসোন্মুখ আত্মার বিকারগ্রস্ত লালসা-বাসনা।

আমি যখন দেখি অসহায় পতিতাদের দুঃসহ জীবন, আমি যখন দেখি যৌন বিলাসী আধুনিকদের সদ্য ভূমিষ্ঠ সন্তান রাস্তার পাশে ছুঁড়ে ফেলতে, আমি যখন দেখি বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে নিজ সন্তানেরই হস্তে নির্যাতিত হতে, তখন সেই মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে কল্পনা করতেও আমার গোটা সত্তা বিদ্রোহ করে ওঠে। আমি কি করে মেনে নেব মানুষকে সৃষ্টির সেরা হিসেবে?

www.pathagar.com

মানুষ নিকৃষ্ট ধরনের কাজে লিপ্ত হয় বলেই যে আল্লাহ মানুষকে নিকৃষ্ট গুণ দিয়েই সৃষ্টি করেছেন এমন উক্তি করাও তো শোভনীয় নয়। মানুষ নিকৃষ্ট গুণাবলী নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছে, তাও তো বিভিন্ন দার্শনিকদের মতে মোটেও সঠিক উক্তি নয়।
পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় 'যার যত ধন, তার তত মান', এহেন নীতির ফলে মানুষ ধনের মানদন্ডে মূল্যায়িত হওয়ার উগ্র বাসনায় ধন অর্জনের জন্য সকল নীতি-নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে যাবতীয় নিকৃষ্ট কাজে জড়িয়ে পড়ে। কারণ যে কোন মূল্যে ধন তার চাই-ই চাই।

অপরদিকে 'মৃত্যুই জীবনের শেষ- পরকাল, হিসেব-নিকেশ বলতে কিছুই নেই' সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার এহেন নীতিও মানুষকে ইন্দ্রিয় লালসা পূরণে এক রকম বেপরোয়াই করে তোলে। এর ফলেও মানুষ আত্মার হাহাকারপূর্ণ শূন্যতা এবং উদ্দেশ্যহীন জীবনকে জড়িয়ে ফেলে বিভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার জটাজালে। সে অবস্থায় নিকৃষ্ট কর্মে লিপ্ত হওয়াতে তার কোন অরুচি হয় না।
যে সমাজে দুর্জয় সাহসিকতা প্রদর্শনই কেবল বাহবার কাজ, তেমন পরিবেশে আত্মার সুকুমারবৃত্তিগুলোর বিকাশ ঘটার পরিবর্তে মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় হিংস্র পশুশক্তি এবং দানবীয় আশা-আকাঙ্খা। ঠিক একইভাবে যে সমাজ ব্যবস্থায় স্রষ্টা আল্লাহর পছন্দ-অপছন্দ ভিত্তিক মানব কর্মের মূল্যায়ন হয়, তেমন সমাজে মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি সাধনেই কর্মকান্ড পরিচালনা করতে গিয়ে আল্লাহর নির্দেশিত এবং পছন্দসই কাজেই লিপ্ত থাকবে। মান-সম্মানের মানদন্ড যদি হয় মহৎ এবং সৎকর্ম ভিত্তিক, তা হলে এ রকম সমাজে মানুষ স্বভাবতই নিকৃষ্ট ধরনের কাজে লিপ্ত হতে অনীহা বোধ করবে। তাই দেখা যাচ্ছে সমাজ ব্যবস্থা এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত চিন্তা-চেতনার ভিত্তিতেই মানুষ উৎকৃষ্ট কিম্বা নিকৃষ্ট কর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্রেরণা সঞ্চয় করে থাকে।

সুতরাং মানুষ কোন যুক্তিতেই নিকৃষ্ট গুণাবলীর সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়নি। যদি তাই হ'ত তাহলে মানুষের পক্ষে উচ্চতর এবং কোন শ্রেষ্ঠতর কর্মে লিপ্ত হওয়া সম্ভবই ছিল না।

মানুষকে আল্লাহ যে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবেই সৃষ্টি করেছেন এর সত্যতা যুগে যুগে বিশ্বে জন্ম লাভকারী মহান মানব-সন্তানদের গৌরবদীপ্ত জীবনী থেকেই অতি ভাস্বর।

কিন্তু মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন কেন? এর পেছনে কারণ বা রহস্যটা কি তাহলে?

না, কোন রহস্য নয়, এর পেছনে রয়েছে বিজ্ঞানসম্মত কারণ এবং যুক্তি।

স্রষ্টার ইচ্ছা এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার প্রতিফলনই হচ্ছে মানুষের সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি হওয়ার মূল কারণ।

www.pathagar.com

স্রষ্টার প্রতিনিধি মানুষের সেই স্রষ্টাকে অগ্রাহ্য করে চলার প্রবণতাই স্রষ্টার রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। স্রষ্টার রহমত থেকে বঞ্চিত মানুষ যেহেতু আর স্রষ্টাকে স্বীকার করে না, সেহেতু তাদের যাবতীয় কার্যক্রমই হয়ে দাঁড়ায় স্রষ্টাদ্রোহী, স্বৈরাচারী, অতএব দায়-দায়িত্বহীন। দায়-দায়িত্বহীন কাজের জবাবদিহিও করতে হয় না তাদেরকে এবং যে কাজের জবাবদিহির ব্যবস্থা নেই, তেমন কাজ সমষ্টি প্রগতির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

সর্বশক্তিমান স্রষ্টার কথা রেখে এবারে আমাদের বিশ্বলোকের কথায়ই ফিরে আসি। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন বয়স্ক মানুষও কখনও সুনির্দিষ্ট ইচ্ছা কিম্বা পরিকল্পনা ছাড়া কোন কিছু সৃষ্টি করে না। বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তি হয়তো বা করে থাকে। সুস্থ মানুষের যে কোন কাজের পেছনেই কোন না কোন যুক্তি, ইচ্ছা কিম্বা পরিকল্পনা অবশ্যই থাকে।

স্রষ্টা সুস্থ নন (নাউযুবিল্লাহ) এমন ধারণা পোষণকারী নিজেই নিশ্চিতভাবে অপ্রকৃতিস্থ হিসেবেবিবেচিতহবে।

তাই স্রষ্টা তাকে সৃষ্টিকুলের শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে ঘোষণা করেছেন, সেই শ্রেষ্ঠ জীবকে নিশ্চিতভাবেই তিনি শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের জন্য পরিপূর্ণ যোগ্যতা এবং গুণাবলী সহকারে কেবল সৃষ্টিই করেননি, ঘোষিত সেই শ্রেষ্ঠ জীবকে নিয়ে যে তাঁর নির্দিষ্ট কতিপয় উদ্দেশ্য রয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য।

তাই স্রষ্টাকে অস্বীকার করার অর্থই হচ্ছে জীবনকে উদ্দেশ্যহীন করে তোলা।

শ্রেষ্ঠ জীবের জন্য নিশ্চিতভাবেই নির্ধারিত রয়েছে শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন স্রষ্টা কর্তৃক নির্ধারিত এবং নির্বাচিত বিধান অনুসরণের মধ্য দিয়েই যে সম্ভব এ কথা অস্বীকার করা যাবে না। মহান স্রষ্টা কর্তৃক সৃষ্ট সৃষ্টির সেরা মানুষ স্রষ্টা নির্ধারিত এবং নির্বাচিত বিধানের মধ্য দিয়ে স্রষ্টা প্রদত্ত গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতে নিশ্চিতভাবেই সক্ষম হবে জেনেই স্রষ্টা মানুষকে দান করেছেন একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। অতএব, স্রষ্টাকে অস্বীকার করার আরেক অর্থই হচ্ছে- স্রষ্টা প্রদত্ত সেই বৈশিষ্ট্য বিবর্জিত হয়ে পড়া। সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি স্রষ্টা অন্য কোন জীবকে আর তেমনভাবে দান করেননি বলে পবিত্র কোরআন সাক্ষ্য দেয়। অন্যান্য জীব-জন্তুর মধ্যে সেই বৈশিষ্ট্যটি ঠিক ততটুকুই বিদ্যমান, যতটুকু না হলে তারা হয়ে যেত একদমই অচল এবং একান্ত নিজস্ব কাজ কর্মগুলো পর্যন্ত চালিয়ে নেয়ারও তারা কোন প্রেরণা পেত না। অর্থাৎ, নিজ অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে যতটুকু অত্যাবশ্যকীয় কেবল ঠিক ততটুকুই লাভ করেছে সেই বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু মানব চরিত্রে সেই বৈশিষ্ট্যটি আল্লাহ বা স্রষ্টা বিশেষভাবেই অংকুরিত করেছেন কেবল এ কারণেই যে, আল্লাহ তাঁর আপন গুণাবলীর সমন্বয়ে সৃষ্টি করেছেন মানুষকে। পবিত্র হাদীসে বর্ণিত আছে- "ইন্নাল্লাহা খালাকা আদামা আলা সুরাতিহী" (নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর নিজ আকৃতি দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন)। আল্লাহ তাঁর আকৃতি, অর্থাৎ তাঁর গুণাবলী দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করতে গেলেন কেন?

www.pathagar.com

আল্লাহর নিজস্ব গুণাবলীর সমন্বয়ে মানুষকে সৃষ্টি করার পেছনে কারণ কেবল একটাই যে, আল্লাহ স্বয়ং নিজেই প্রকাশিত হওয়ার বাসনা পোষণ করেছিলেন। এ বিষয়েও স্পষ্ট হাদীসরয়েছেঃ

"কুনতু কান্‌যান মাখফিয়্যান ফা আহবাবতু আন উয্‌হারা ফা খালাকতুল খাল্‌কা।"

অর্থাৎ "আমি খনির ন্যায় গুপ্ত ছিলাম, আমি আত্মপ্রকাশ করতে চাইলাম। অতএব, আমি সৃষ্টিজগত সৃষ্টি করলাম।"

যেহেতু, আল্লাহ নিজেই আত্মপ্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেহেতুই আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সৃষ্টি করলেন। আল্লাহর গুণাবলীতে সৃষ্ট মানুষ তো আর নিকৃষ্ট হতে পারে না। তাকে অবশ্যই সৃষ্টির সেরা হতে হবে। আল্লাহর পবিত্র বিধান কোরআনে আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ার বুকে তাঁর খলীফা বা তাঁরই প্রতিনিধি হিসেবেও অভিহিত করেছেন। "ইন্নী জায়লুন ফিল আরদে খলীফা"– "নিশ্চয়ই আমি দুনিয়ার বুকে প্রতিনিধি সৃষ্টি করেছি।" এই দুনিয়ার বুকে প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহ যাকে সৃষ্টি করেছেন, সেই মানুষের সকল কর্মকান্ড আল্লাহ মনোনীত বিধান মোতাবেকই যে পরিচালিত হওয়া বাঞ্ছনীয় সে কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে কি? তাই আল্লাহর মনোনীত বিধান অবলম্বন এবং অনুসরণই মানুষকে যে শ্রেষ্ঠত্বে পৌঁছে দেবে একথাও অনস্বীকার্য নয় কি?

করুণাময় আল্লাহ মানুষকে সীমিত স্বাধীনতা এবং স্বাধীন বিবেকবুদ্ধি দান করেছেন এবং আল্লাহর সৃষ্টিধারাকে সুষ্ঠুভাবে অব্যাহত রাখার জন্য মানুষসহ সকল জীবকেই প্রজনন ক্ষমতাও দান করেছেন। এই প্রজনন বহাল রাখার স্বার্থেই আল্লাহ দান করেছেন প্রজনন প্রক্রিয়াজনিত আনন্দ ভোগের লক্ষ্যে বিশেষ অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ।

যেহেতু মানুষ সীমিত স্বাধীনতার সত্তাধারী, সেহেতু সকল কাজেই সে হবে আনন্দপিপাসু এবং আনন্দ সন্ধানেই লিপ্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে আল্লাহ কর্তৃক নির্ণীত সেই প্রজনন প্রক্রিয়া মানুষ অব্যাহত রাখতে বাধ্য থাকবে।

তবে এই প্রজনন প্রক্রিয়াকে মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি অব্যাহত রাখার পরিবর্তে কেবল যদি আনন্দ ভোগের হাতিয়ার হিসেবেই ব্যবহার করতে চায়, তাহলে তা হবে প্রজনন প্রক্রিয়ার যথেচ্ছ ব্যবহার এবং এ ধরনের যথেচ্ছাচারের মধ্য দিয়ে মানুষ তার নিজস্ব ধ্বংসকেই কেবল ডেকে আনবে। এর স্পষ্ট প্রমাণ আজকের পাশ্চাত্য জগত–এর জ্বলন্ত প্রমাণ সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া, পুঁজিবাদী আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানীসহ সমগ্র ইউরোপীয় জগত, যেখানে নর–নারীর অবাধ যৌনতৃষ্ণা মেটানোর ব্যাপক প্রতিযোগিতা স্রষ্টার নির্ধারিত নিয়ম–বিধি সীমাহীনভাবেই লংঘন করেছে। যার ফলে, নানান কঠিন শারীরিক ব্যাধিসহ জটিল ধরনের মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা তাদের সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনতছনছকরে দিয়েছে।

নারী চিৎকার করে বেড়াচ্ছে "মা হ'ব না", নরের চিৎকার "বিয়ে করব না" ধরনের আজগুবি দাবী প্রাচুর্যপূর্ণ দেশ ও জাতিসমূহের সামাজিক স্থিতিশীলতাই কেবল বিনষ্ট

www.pathagar.com

করেনি, সমাজে নর-নারীর আনুপাতিক হারের ভারসাম্য উদ্বেগজনকভাবেই ধ্বংসের মুখোমুখি করেছে। প্রজনন প্রক্রিয়ায় বন্ধ্যাত্ব এসেছে, প্রজনন ক্ষমতা ব্যয়িত হচ্ছে উদগ্র ভোগ-লালসার অগ্নিকুন্ডে।

সে সকল দেশের সরকারসমূহ এখন নর-নারীকে সন্তান জন্মানোর জন্য জাতীয়ভাবে আবেদন-নিবেদন করে যাচ্ছে। এমনকি পুরস্কার ঘোষণার মধ্য দিয়েও নর-নারীকে সন্তান জন্মানোর লক্ষ্যে উৎসাহী করার দায়িত্বে লিপ্ত। ভেবে দেখুন একবার, সীমা লংঘনকারীদের দুরবস্থা। তাই আল্লাহ পাক যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন মানুষকে অবশ্যই সেই সীমার আওতায় থেকেই জীবনের বিকাশ ঘটাতে হবে। অন্যথায়, পবিত্র কোরআন অনুযায়ী মানুষের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। কারণ, আল্লাহ পাক সীমা লংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।

পবিত্র কোরআনে বর্ণিত, অতীতে অনেক জাতিই সীমালংঘন করার ফলে সম্পূর্ণভাবেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এদের মধ্যে আদ্ এবং সামুদ জাতি বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য।

তাই আল্লাহ্র সৃষ্টি এই সেরা জীব মানুষ আল্লাহকে অস্বীকার করে নিজস্ব খেয়ালখুশী মত জীবন পরিচালিত করতে থাকবে, তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার তো যৌক্তিক কোন কারণই থাকতে পারে না।

খলীফা হিসেবে মনোনীত মানুষ আল্লাহ নির্ধারিত বিধান কায়েম করবে, এ ছাড়া স্রষ্টার স্বাভাবিক ইচ্ছা আর কী-ইবা হতে পারে। এই মানুষ যাতে সক্রিয় এবং সফল হতে পারে, সে লক্ষ্যেই আল্লাহ পূর্বে উল্লিখিত সেই বিশেষগুণে গুণান্বিত করেছেন মানুষকে। সেই বিশেষ গুণটি হচ্ছে দায়িত্ববোধ। এই দায়িত্ববোধের সাথে সাথেই আল্লাহ মানুষকে অপর একটি প্রক্রিয়া বা পরীক্ষায় বেঁধে ফেলেছেন, যাতে দায়িত্ববোধ নামক গুণটির ধারাবাহিক পরিচর্যা হতে থাকে। সে গুণটি হচ্ছে মানুষের 'অসহায়ত্ববোধ'।

'দায়িত্ববোধ' এবং 'অসহায়ত্ববোধ' এ দু'টি পাশাপাশি অবস্থান করার মূল হেতুটা কি, তা খুঁজে বের করার মধ্য দিয়ে আমরা অনেক প্রশ্নের জবাব লাভে সক্ষম হব। যেমন, কেনই বা মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হল?

মানুষের বর্তমান সংকটের মূল কারণ কি?

সংকটের প্রতিকার বা সংকট থেকে পরিত্রাণ লাভের পথ ও পন্থা কি? ইত্যাদি।

মানুষের নিজ প্রয়োজনেই 'দায়িত্ববোধ' এবং 'অসহায়ত্ববোধের' মধ্যকার দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটি বুঝতে হবে, তা না হলে 'দায়িত্ববোধ' গুণটি প্রয়োজনে থাকবে অচল এবং অপ্রয়োজনে হবে সক্রিয়। অপরদিকে, অসহায়ত্ব দূরীকরণের আর কোন পথই থাকবে না, যদি মানুষ 'অসহায়ত্বের' সাথে সঠিক সময়ে 'দায়িত্ববোধ' গুণের সংযোগ সাধনে ব্যর্থ হয়।

www.pathagar.com

(খ) অসহায়ত্ব

সর্বপ্রথমে মানুষের অসহায়ত্ব দিয়েই শুরু করি, যেহেতু এই অসহায়ত্ব দিয়েই মানুষের চলার পথ শুরু। সৃষ্টির সেরা জীব 'আশরাফুল মাখলুকাত' হওয়া সত্ত্বেও জন্মলগ্নেই সেই মানুষ সর্বাধিক অসহায় কেন? অন্যান্য জীব-জন্তু জন্মের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তো চলাফেরা, খাওয়া-দাওয়া চালিয়ে যাওয়ার মত একটা নিজস্ব অবস্থান করে নেয়। কিন্তু সৃষ্টির সেরা জীব হওয়া সত্ত্বেও এই মানুষ নামক জীবটিকে সর্বাধিক অসহায় হিসেবে সৃষ্টি করার পেছনে স্রষ্টার উদ্দেশ্যটাই বা কি হতে পারে? এ বিষয়েও যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনারঅবকাশ রয়েছে।

স্বাধীন বুদ্ধি-বিবেকসম্পন্ন এবং সীমিত স্বাধীনতার স্বত্বাধিকারী এই মানুষ জন্মলগ্নের পরে নিজের ইচ্ছায় মল-পানি ত্যাগ এবং কান্না-হাসি করা ছাড়া আর কিছুই করার শক্তি-সামর্থ রাখে না। জন্মলগ্নের কেবল পরের কথাই বলি কেন, মরণশীল এই সেরা জীবটি জীবনের প্রতি পদে পদেই তো অসহায়ত্ববোধে কাতর হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কাছে সে অসহায়, বন্য হিংস্র জন্তুদের কাছে সে অসহায় এবং এমন কি সমাজ জীবনেও তো সে বিভিন্ন দিক থেকে নিদারুণ অসহায়ত্বের আবর্তে হা-হুতাশ করে বেড়ায়।

আল্লাহ্ মানুষকে কেবল যদি এই সীমাহীন অসহায়ত্ব দিয়েই সৃষ্টি করে রাখতেন, তাহলে জন্মের সংগে সংগেই মানব সন্তানটির অবস্থা যে কি রূপ ধারণ করত তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু না, তা নয়। জন্মলব্ধ সন্তানের দায়িত্ব নেয়ার জন্য রয়েছেন মা, খালা, ফুফু, দাদী, নানী ইত্যাদি মমতাপূর্ণ ঘনিষ্ঠ স্বজন। কেউ না কেউ ভূমিষ্ঠ সন্তানটির দায়-দায়িত্ব বুঝে নেয়। ক্ষণিকের জন্যও আর ভূমিষ্ঠ সন্তানটি অসহায়ত্ব বোধ করে না। ভূমিষ্ঠ শিশুর অসহায়ত্বের সংগে যদি এই দায়িত্বের তাৎক্ষণিক সংযোগ এবং স্থায়ী সম্পর্ক গড়ে না উঠত, তাহলে ভূমিষ্ঠ সন্তানটির অস্তিত্বই হয়ে পড়ত বিপন্ন।

তাই করুণাময় আল্লাহ তাআলা অসহায়ত্ববোধের মোকাবেলা করার জন্য মানুষকে দান করেছেন সচেতন 'দায়িত্ববোধ,' যা মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসা, সেবা-যত্ন এবং বিচক্ষণ বিচার ক্ষমতারূপে প্রতিফলিত হতে থাকে। এই দায়িত্ববোধশক্তির অভাব বা অনুপস্থিতিই মানুষকে প্রকৃতপক্ষে অসহায়ত্বের গভীর জঠরে নিক্ষেপ করে মানুষের অস্তিত্ব মুছে ফেলার লক্ষ্যে যথেষ্ট ছিল না কি? হয়ত বা তাই।

কিন্তু আত্মপ্রকাশে আগ্রহী স্রষ্টা একটি প্রাণীকে তাঁর সৃষ্টির সেরা হিসেবে তৈরি করেছেন নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্য সাধনের জন্যেই কেবল, উদ্দেশ্যহীনভাবে ধ্বংস বা বিলুপ্তি সাধনের জন্য নিশ্চয়ই নয়।

www.pathagar.com

মানুষ, অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মরণশীল হলেও যেহেতু মানুষই দুনিয়ার বুকে আল্লাহ কর্তৃক খলীফা হিসেবে মনোনীত জীব, সেহেতুই মরণশীলতা সত্ত্বেও মানুষের জীবিত অবস্থায় আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত কিছু কর্মকান্ড অবশ্যই মানুষকে পরিপূর্ণ করে যেতে হবে। সেই নির্ধারিত কর্মকান্ডের পরিপূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যেই স্রষ্টা মানুষের মধ্যে সঞ্চার করেছেন দায়িত্ববোধশক্তি। মানুষের তেজ, বীর্য এবং বাসনার লাগাম যদি দায়িত্ববোধ শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না থাকে, তাহলে মানুষের জীবনটাই হ'ত অঘটন এবং দুর্ঘটনার আস্তানা। দায়িত্ববোধশক্তির প্রয়োজন সুস্থ এবং সুষ্ঠু বিকাশের স্বার্থেই কেবল।

দায়িত্ববোধশক্তির কোন প্রয়োজনই হ'ত না যদি আল্লাহ্ মানুষকে অসহায়ত্বের সমন্বয়ে সৃষ্টি না করতেন। অসহায়ত্বের অবর্তমানে দায়িত্ববোধশক্তির বিকশিত হওয়ার যেমন কোন ক্ষেত্রই থাকত না, ঠিক একইভাবে দায়িত্বশক্তির অবর্তমানতা অসহায়ত্বকে রূপান্তরিত করত নিশ্চিত ধ্বংসে। 'অসহায়ত্ব' এবং 'দায়িত্ববোধশক্তির' মধ্যকার এই যে নিবিড় সম্পর্ক এটা কেন? এটা নেহায়েতই একটা দুর্ঘটনা মাত্র? বিষয়টিকে তলিয়ে দেখার প্রয়োজনই যে কেবল রয়েছে তা নয়, বিষয়টি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা অর্জন করা মানবতার বিকাশ এবং সুষ্ঠু লালনের জন্য অত্যাবশকীয় বলেই আমি মনে করি। অসহায়ত্বের সংগে 'দায়িত্ববোধ' শক্তির সম্পর্ক নিছক কোন দুর্ঘটনা নয়, বরং একটা ঐশী পরিকল্পনার অনিবার্য ফলশ্রুতি।

(গ) দায়িত্ববোধশক্তি

আল্লাহর তরফ থেকে প্রদত্ত দায়িত্ববোধশক্তি উদ্দেশ্যহীন হতে পারে না। কারণ, আল্লাহ সৃষ্টির কোন কিছুই নিছক খেলার ছলে সৃষ্টি করেননি। প্রখর দায়িত্ববোধশক্তিই কেবল সর্বশক্তিমান স্রষ্টার প্রতিনিধিত্ব প্রকৃত অর্থে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম। এই বিশেষ গুণটি ছাড়া অন্য কোন গুণ বা গুণাবলী স্রষ্টার প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা রাখে না বিধায়ই করুণাময় স্রষ্টা তাঁর নিজস্ব সিফাত 'দায়িত্ববোধশক্তি' সহকারেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি দুনিয়ায় তাঁর ইচ্ছা ও বাসনা বাস্তবায়িত করা এবং সেই বাস্তবায়নের ধারা সযত্নে বহাল ও লালন করার এবং তার বিকাশ সাধনের জন্যই আল্লাহ্ এই বিশেষ সিফাতটি মানুষকে প্রদান করেছেন এবং কেবল এই একটি কারণেই মানুষকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে বলে কোরআন-হাদীস সাক্ষ্য দেয়। এই গুণটির সাহায্যেই মানুষ সর্বপ্রকার অসহায়ত্ব থেকে কেবল নিজেই পরিত্রাণ লাভ করে না, সমাজে অবস্থিত অন্যান্য সকল প্রাণীকেও অসহায়ত্ব থেকে মুক্ত করে এবং উত্তরোত্তর বিকাশ সাধনেও সক্ষম হয়।

আল্লাহ্র সৃষ্টির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই সৃষ্টি এবং সৃষ্টির সুষ্ঠু বিকাশ পদ্ধতির রহস্য অনুধাবন করা যায়। সৃষ্ট অন্যান্য জীব-জন্তু, পাখী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদির মধ্যেও স্রষ্টা কমবেশী দায়িত্ববোধশক্তি প্রদান করেছেন এবং কেবল এ কারণেই সৃষ্টির বিকাশধারা

www.pathagar.com

এবং রক্ষণাবেক্ষণ প্রক্রিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবেই প্রবহমান। কিন্তু মানুষ ছাড়া অন্যান্য জীবের মধ্যে দায়িত্ববোধশক্তির ব্যবহার কেবল নিজ নিজ অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই নিয়োজিত, সমষ্টির স্বার্থ কিম্বা বিকাশের অর্থে তারা দায়িত্ববোধশক্তি প্রয়োগ করতে অক্ষমই নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসচেতনও বটে।

মানুষের দায়িত্ববোধশক্তির লক্ষ্যই কেবল ভিন্ন। কারণ, মানুষ তার দায়িত্ববোধশক্তি দিয়ে সারা জাহানের জীবমন্ডলীসহ অন্যান্য পারিপার্শ্বিকতারও সুষ্ঠু বিকাশ এবং লালনকার্য নিশ্চিত করবে এটাই আল্লাহর উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়ত, মানুষই দায়িত্ববোধশক্তি দিয়ে আল্লাহর মনোনীত বিধান–নির্দেশিত পথে অটল থেকে আল্লাহর সকল নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন এবং বাস্তবায়ন করার মধ্য দিয়ে 'আল্লাহরই আত্মপ্রকাশের' সেই ঐশী বাসনা পূরণ করবে এটাই মূলত আল্লাহর সিফাত দায়িত্ববোধশক্তি প্রদান করে মানুষকে ধরার বুকে প্রেরণের মূল কারণ। দায়িত্ববোধশক্তিহীন মানুষ সৃষ্টির তাৎপর্য ও স্রষ্টার বিরাটত্ব উপলব্ধি করার কোনই তাগিদ বোধ করত না। এ ধরনের তাগিদ বোধের অনুপস্থিতি মানুষকে সৃজনশীল করে তোলার পরিবর্তে করে তুলতো বিপর্যয় সৃষ্টিকারী উচ্ছৃংখল জীব। তাই সংক্ষেপে বলতে গেলে সৃষ্টির বিকাশ, সুষ্ঠু লালন–পালনের জন্য অলংঘনীয় শর্তই হচ্ছে অসহায়ত্বের সংগে দায়িত্বের অর্থাৎ দায়িত্ববোধশক্তির অবিচ্ছেদ্য সংযোগ স্থাপন। এই শর্তটি যেখানে যত সঠিক এবং সুষ্ঠুভাবে বহাল থাকবে, সেখানে ততটাই সুষ্ঠু এবং সঠিক হবে সৃষ্টির বিকাশ এবং রক্ষণাবেক্ষণ।

অপরদিকে, এই শর্তটির যে ক্ষেত্রেই যতটা ব্যতিক্রম ঘটবে, সে ক্ষেত্রে ঠিক ততটাই ঘটবে সৃষ্টির বিকাশে প্রতিবন্ধকতা। সরল কথায় এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, প্রকৃতিসহ মানব জীবনের সুস্থ এবং সুষ্ঠু বিকাশের প্রধান শর্ত হচ্ছে অসহায়ত্বের সংগে দায়িত্ববোধশক্তির স্থায়ী সংযোগ এবং গভীরতম সম্পর্ক। এই অলংঘনীয় শর্তের ছেদ ঘটে যাওয়া কিম্বা ইচ্ছাপূর্ণভাবে কোনরূপ ছেদ ঘটানোর অর্থই হচ্ছে সৃষ্টির অসহায়ত্ব এমন বৃদ্ধি করা, যার স্বাভাবিক পরিণতি অস্তিত্বেরই বিলুপ্তি সাধন।

এহেন অবস্থায় মানুষ আর সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে বিবেচিত হয় না। কারণ, সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে বিবেচিত হওয়ার প্রধান এবং একমাত্র শর্তই হচ্ছে, দায়িত্ববোধশক্তির আল্লাহর বাসনা অনুযায়ী সঠিক ব্যবহার ও প্রয়োগ।

অন্যথায়, তার সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে বিবেচিত হওয়ারও কোন যৌক্তিক কারণ থাকতে পারে না।

www.pathagar.com

(ঘ) ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সংকটঃ মূল কারণ এবং প্রতিকার

আমাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সংকটের মূলে কোন্ কারণটি প্রধানতম, তা খতিয়ে দেখা অত্যাবশ্যকীয়। আজকাল আমরা অনেকেই বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের অসহায়ত্ব নিয়ে নানানভাবে চিন্তা-ভাবনা করি এবং অসহায়ভাবেই আমরা আমাদের মতামতও প্রকাশ করে থাকি। বিশেষ করে সমাজবিদ, বুদ্ধিজীবী, রাজনীতিক এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ সমাজকে বিশৃঙ্খল অরাজকতাপূর্ণ, নীতি-নৈতিকতাহীন ইত্যাকার ভূষণে ভূষিতও করে থাকেন।

সমাজদেহ থেকে শোষণ-যুলুম, অবিচার, কুসংস্কার, গোঁড়ামি, গোলামী নিপাত করে অহরহই মানুষের জন্য একটি শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করারও দীপ্ত অঙ্গীকার ব্যক্ত করে থাকেন। দেশী-বিদেশী সর্বরকম ষড়যন্ত্র উচ্ছেদ করে যুগান্তকারী বিপ্লব সাধনের বুলিও আমাদের মুখে নিতান্ত কম শোনা যায়নি। কিন্তু তবু যেন সমাজদেহ সুস্থ হয়ে উঠছে না। প্রগতি এবং শান্তির পরিবর্তে সমাজদেহে ক্রমশই যেন ছুটে আসছে অধগতি এবং চরম অশান্তি।

ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে উদ্ভূত সভ্যতা মানুষকে ভোগকেন্দ্রিক এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক করে তুলেছে। এই আধুনিক সভ্যতা মানুষকে প্রগতির নামে বাইরের জৌলুস ও চাকচিক্যের দিকে আকৃষ্ট করেছে। বিজ্ঞানের নামে মানুষকে শিখিয়েছে মানুষ হত্যার নানান কৌশলসহ নারকীয় হত্যাযজ্ঞ সৃষ্টির প্রভূত শয়তানী জ্ঞান। আধুনিকতার নামে শিখিয়েছে ঐতিহ্য এবং স্বীকৃত মূল্যবোধের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং নষ্টামি।

আধুনিক সভ্যতা মানুষকে প্রকৃতির উপর বেশ খানিকটা প্রভুত্ব করতে শিখালেও মানুষকে ভোগ-বিলাসের কাছে করে তুলেছে চরম অসহায় এবং এই সীমাহীন ভোগ-বিলাস আয়ত্ত করতে গিয়ে মানুষ হারিয়ে বসে স্রষ্টা প্রদত্ত সেই বিশেষ গুণটি 'দায়িত্ববোধশক্তি' এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীবের পরিচয় এবং সত্তাও হারিয়ে ফেলে। স্রষ্টার বিধান মানুষকে 'শ্রেষ্ঠ' জীব হিসেবে ঘোষণা করেছে। স্রষ্টার 'বিধান বর্জন, কেবল ঘোষণাটি গ্রহণ'-নীতি ঘোষিত 'শ্রেষ্ঠত্ব' বহাল রাখতে অপারগ হবে, এতে বিস্ময়েরই বা কি আছে?

অপরদিকে, প্রভুত্ব বিস্তারের অভিলাষ মানুষকে করেছে সীমাহীন লোভী এবং হিংস্র। এই অভিশাপ থেকে আমাদের দেশের মত অনুন্নত সমাজ ব্যবস্থাও মুক্ত নয়। সমাজ পরিবর্তনের প্রক্রিয়া এহেন অবস্থায় কোন্ দর্শন এবং পদ্ধতির মাধ্যমে কার্যকর করা হবে, সে বিষয়টির সঠিক মূল্যায়ন ছাড়া কেবল বাসনার জোরেই তা কখনো সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

প্রচলিত পশ্চিমা দর্শন, পশ্চিমা ধাঁচ এবং পদ্ধতির মাধ্যমেই যদি সমাজ পরিবর্তনের গতানুগতিক ধারা অব্যাহত রাখা হয়, তাহলে ধীরে ধীরে মানব জীবন যে কোন্ স্তরে গিয়ে পৌঁছবে, তা সহজেই অনুমেয়।

প্রচলিত পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের জীবনকে সুখ-শান্তিময় করে তুলতে গিয়ে আমরা বারবার এক অন্ধগলির মধ্যেই ঘুরপাক খেয়ে চলছি। হাঁপিয়ে উঠছি প্রতিনিয়ত। মানুষের জীবনে অসহায়ত্ব বাড়ছে বৈ কমছে না বিন্দুমাত্রও।

এই প্রবন্ধের ভূমিকাতেই আমি যে আলোচনা রেখেছি, সেই আলোকেই আমাদের খুঁজতে হবে অসহায়ত্বের মূল কারণটি।

কারণ, প্রথমেই আমি উল্লেখ করেছি আল্লাহ পাক মানুষকে তাঁর আপন গুণে গুণান্বিত করেই সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে খলীফা হিসেবে মনোনীত করে দুনিয়ার বুকে প্রেরণ করেছেন। লক্ষ্য তাঁরই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা। নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন উদ্দেশ্য। আল-কোরআনকে মনোনীত করেছেন তাঁরই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দর্শন এবং বিধান হিসেবে। তিনি প্রেরণ করেছেন তাঁর প্রিয় দোস্ত রসূল হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে, যিনি দুনিয়ার বুকে আল্লাহর প্রেরিত বিধান নিজ কর্মজীবনে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবে কায়েম করার মধ্য দিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ রেখে গেছেন, দীক্ষিত করে গেছেন মানুষকে। এমন একটি সুপরিকল্পিত জীবন কারো খেয়ালখুশী মত উদ্দেশ্যহীন এবং নীতি-নৈতিকতাহীন ধারায় চলতে পারে- এহেন চিন্তা-চেতনা বিস্ময়করভাবেই উদ্ভট নয় কি?

এহেন চিন্তা-চেতনার ধারকরাই মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব মুছে ফেলার এক জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। অজ্ঞেয়বাদী (Agnostic) এবং নাস্তিক্যবাদী (Atheistic) মহলই বিশ্ব থেকে স্রষ্টার পরিচয় মুছে ফেলে সেখানে নিজেদের বাহাদুরী প্রমাণ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত।

তাই তারা জীবনকে উদ্দেশ্যহীন হিসেবে গণ্য করেই কোনরূপ নীতি-নৈতিকতার বাঁধন ছাড়া গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়ার তত্ত্বে বিশ্বাসী। মানুষকে যে আল্লাহ দায়িত্ববোধশক্তি সহকারেই সৃষ্টি করেছেন এ তত্ত্বেও তারা বিশ্বাস তো নয়ই বরং এরা মনে করে যে, মানুষ সমাজে বসবাস করার মধ্য দিয়েই দয়িত্ববোধশক্তি শ্রম প্রয়োগের প্রক্রিয়ায় আয়ত্ত করে। এরাই মূলত সৃষ্টির অস্তিত্ব, বিকাশ এবং লালন-পালনের সেই প্রধান শর্তটি-'অসহায়ত্ব' এবং 'দায়িত্ববোধশক্তি'র মধ্যকার সংযোগ এবং সম্পর্কে ছেদ ঘটায়। এই ছেদ ঘটানোর ফলেই প্রকৃতি-স্বীকৃতি বিকাশ পদ্ধতিতে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয় এবং সমাজ জীবনে অসহায়ত্ব বৃদ্ধি পেতে পেতে সমাজ জীবন ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে স্বাভাবিক বিকাশ মন্থর হতে হতে এক পর্যায়ে এসে থেমে যায় সমাজের চাকা। অসহায়ত্ব রূপান্তরিত হয় অধঃপতনে এবং অধঃপতন পরিণত হয় ধ্বংসযজ্ঞে। দায়িত্বহীন অবস্থায় নবজাত শিশুকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে রাখলে তার পরিণতি কি হতে পারে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

www.pathagar.com

সমাজ জীবন এর ব্যতিক্রম নয়। সমাজ জীবন যেহেতু সমষ্টিকে নিয়ে, সেহেতু সমাজের ধ্বংস রাতারাতি দৃষ্টিগোচর না হলেও অচিরেই যে ধ্বংসের চিহ্নগুলো স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠবে এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই।

অসহায়ত্বের পাশাপাশি দায়িত্বের অনুপস্থিতিই অসহায়ত্ব বৃদ্ধি এবং ব্যক্তি ও সমাজদেহে সংকট উৎপত্তির মূল কারণ। মানুষের মধ্য থেকে ঐশী সিফাত দায়িত্ববোধশক্তির বিলোপ ঘটে গেলেই সমাজদেহে কিম্বা মানব জীবন ধ্বংসের কবলে নিপতিত হয় এবং তাকে রক্ষা করার আর কোন উপায়ই থাকে না।

দুঃখজনক হলেও একথা অত্যন্ত বাস্তব যে, বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা প্রত্যক্ষ করলে আমাদের বিরাজমান সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের সীমাহীন অসহায়ত্বের মূল কারণ হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে সেই একই শর্ত লংঘন। মানুষ তার নিজস্ব খেয়ালখুশী মত চলার আচরণ দিয়ে ছেদ ঘটিয়েছে সেই অসহায়ত্ব–দায়িত্ববোধ সংযোগস্থলে।

এই অধঃপতিত করুণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে মানুষকে আল্লাহর পবিত্র বিধান কোরআন–হাদীস নির্দেশিত বিধিমালা অনুসারে জীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং পুনর্বিন্যাস ঘটাতে হবে। এই পদ্ধতি অনুসরণের মধ্য দিয়েই কেবল মানুষ তার মরণশীল জীবনের উদ্দেশ্য, অর্থ এবং গুরুত্ব অনুধাবনে পরিপূর্ণভাবে সক্ষম হবে। জীবনের উদ্দেশ্য, অর্থ এবং গুরুত্ব অনুধাবনে ব্যর্থ মানুষ স্রষ্টার সৃষ্টিধারার বিকাশ এবং লালনের প্রধান এবং অলংঘনীয় শর্তটি বুঝে উঠতে সক্ষম হবে না বিধায় তা মেনে চলারও কোনই তাগিদ বোধ করার কথা নয়।

এ কারণেই সমাজ জীবনে মানুষ আজ সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর চেয়েও অসহায়। মানুষের দুঃখে মানুষ আজ আর ছুটে আসার কোনরূপ তাগিদ কিম্বা আগ্রহবোধ করে না। দায়িত্ববোধশক্তির বিলুপ্তি মানুষকে করে তুলেছে কতকটা বন্য পশুর মতই উদ্বেগহীন–উদাসীন।

(৬) জীবন অর্থবোধক এবং উদ্দেশ্য ভিত্তিক

প্রচলিত সমাজ কাঠামোতে কেউই কারো দায়িত্ব গ্রহণ করতে চাচ্ছে না। ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, প্রশাসনিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও দায়িত্বহীনতার স্পষ্ট ছাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। সকলেই যেন অত্যন্ত সচেতনভাবেই এড়িয়ে চলছে দায়িত্ব। এটা পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থারই প্রতিফলন। অপরের প্রতি দায়িত্ব–কর্তব্য এড়াতে গিয়ে নিজের জীবনকেও মানুষ এলোমেলো, অবিন্যস্ত এবং অসুন্দর করে তোলার বেপরোয়া এক প্রতিযোগিতায় মত্ত। সঠিক দায়িত্ব পালনই যে মানুষের ব্যক্তি জীবনকে সুষ্ঠু ও সুন্দর করে তোলে, সুন্দর করে তোলে সমাজ জীবন ও পারিপার্শ্বিকতাকে, এ সত্যটি মানুষ

www.pathagar.com

বেমালুমই ভুলতে চলেছে। এর মূল কারণই হচ্ছে মানুষ তার জীবনের অর্থ, উদ্দেশ্য এবং গুরুত্ব সম্পর্কে মোটেও সচেতন নয় এবং সচেতন নয় এ কারণেই যে, মানুষ আল্লাহর প্রেরিত বিধান পবিত্র কোরআনের আলো গ্রহণ করতে হয় অক্ষম, নতুবা গ্রহণ করার কোন উপযুক্ত সুযোগই হয়ত বা লাভ করেনি। যে মানুষ স্রষ্টার অস্তিত্ব সম্পর্কেই অচেতন, অসচেতন, সন্দিহান অথবা অবিশ্বাসী, সে মানুষ সৃষ্ট জীবের সুষ্ঠু বিকাশ এবং সংরক্ষণের জন্য তাগিদ বা যন্ত্রণা বোধ করতে যাবেই বা কেন? এটা তার অপরাধ নয়, এটা তার প্রাপ্ত শিক্ষা এবং সেই শিক্ষাভিত্তিক গড়ে ওঠা মূল্যবোধেরই অন্তর্নিহিত সংকট।

এই সংকটই মানুষকে প্রকৃত অর্থে নির্বোধ করে তোলার জন্য দায়ী। এই সকট সৃষ্টি কোন দুর্ঘটনা নয়, এটা মূলত পবিত্র কোরআনের কট্টর বিরোধী ইহুদী-নাসারাদের "সুস্থ মস্তিকের শয়তানী ষড়যন্ত্র"। তাদের দর্শনে তৈরী মানুষ হবে স্বেচ্ছাচারী, বন্য পশুর মতই হিংস্র এবং নিতান্তই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। এর ব্যতিক্রম যেখানে যতটুকু লক্ষ্য করা যায় তা নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির একান্ত লক্ষ্যেই কেবল। স্রষ্টায় সন্দিহান এবং অবিশ্বাসী মানুষ সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে কেবল এই অর্থে যে, তারা যে কোন উপায়ে তাদের ক্ষমতা, প্রতাপ এবং নেতৃত্ব সাধারণ মানুষের উপর আরোপিত রাখতে চায়, যাতে তাদের অর্থলিপ্সা, ভোগলিপ্সাসহ যাবতীয় স্বৈরাচার এবং পাশবিক কুকর্ম অব্যাহত রাখার সুযোগ লাভে সমর্থ হয়। মানুষের সুখ-শান্তি কিম্বা মনুষ্যত্বের সুষ্ঠু বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে তাদের তেমন কোন আগ্রহ কিম্বা উদ্বেগ থাকে না। কারণ, স্রষ্টায় অবিশ্বাসী নেতৃত্বের চিন্তা-চেতনার কেন্দ্রবিন্দুই হচ্ছে আল্লাহ ঘোষিত জীবনের অর্থ এবং উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। মানুষের সার্বিক মঙ্গল-কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যেই আল্লাহর পবিত্র বিধান। সেই বিধানকে ইচ্ছাকৃতভাবে উপেক্ষা করার অর্থই হচ্ছে সুনির্দিষ্ট পথে মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা নয়, বরং বিভ্রান্তির পথে মানুষের ভাগ্যকে ঠেলে দেয়া এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নিজস্ব শয়তানী ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করা।

মানব জীবনের মূল অর্থ এবং উদ্দেশ্যকে অগ্রাহ্য করে জীবনকে সাজিয়ে তোলার যতই কৌশল এবং প্রয়াস নেয়া হোক না কেন, তাতে হয়ত বা জীবনের কোন কোন ক্ষেত্রে নানান রং লাগিয়ে তাকে বাহ্যিকভাবে ঝলমলিয়ে তোলা যেতে পারে, কিন্তু তার অর্থ জীবনের সত্যিকার এবং পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন বোঝায় না। অন্তঃসারশূন্য বাহ্যিক চাকচিক্যই যদি সবকিছু হ'ত। তাহলে বিশ্বের সম্পদশালীরা তাদের প্রিয়জনদের মৃত্যুতে শোকাভিভূত হওয়ার পরিবর্তে প্রিয়জনদের মৃত দেহগুলোকে বাহ্যিকভাবে সুন্দর করে সাজিয়ে-গুছিয়েই তাদের ড্রয়িং রুমে রেখে দিত। কিন্তু না, বাস্তবে আদৌ তা নয়। বাহ্যিক চাকচিক্য যেমন কখনো প্রাণের বিকল্প হতে পারে না, ঠিক তেমনি উদ্দেশ্যহীন মানব জীবনও আল্লাহ ঘোষিত নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ভিত্তিক জীবনেরও বিকল্প হতে পারে না। তাই সৃষ্টির সেরা মানুষকে জীবনের অর্থ, উদ্দেশ্য এবং গুরুত্ব অবশ্যি অনুধাবন করতে হবে। তা না হলে এক উদ্দেশ্যহীন জীবনের জটাজালে সে নিজকে এমনভাবে জড়িয়ে ফেলবে যে, নিরর্থক জীবনের হতাশা এবং প্রতারণা তাকে বাধ্য করবে পাপের পংকিলে

www.pathagar.com

ডুবে থাকতে। অপরদিকে, জীবনের যথার্থতা রক্ষার স্বার্থে মানুষকে কেবল ভাত-কাপড়ের জন্যই সংগ্রাম অব্যাহত রাখলে চলবে না। তার সংগ্রাম হবে আল্লাহ ঘোষিত 'শ্রেষ্ঠত্ব' পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম! সে সংগ্রামের ভিত্তিই হতে হবে আল্লাহ মনোনীত বিধান। এ বিধান আল্লাহ প্রেরিত রসূল (সঃ)-এর জীবনে সফলভাবেই বাস্তবায়িত হয়েছে। তাই তাঁর রেখে যাওয়া সুন্নাত হবে মানুষের জীবন সংগ্রামে আলোকবর্তিকা।

(চ) শেষ কথা

এই দুনিয়া সৃষ্টি করে আল্লাহ তাঁর আত্মপ্রকাশ লাভের বাসনা বাস্তবায়ন এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে মানুষকে সৃষ্ট অন্যান্য সকল জীবের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব সহকারে প্রণ করেছেন। আল্লাহ বা সেই পরম করুণাময় স্রষ্টা মানুষকে নির্দিষ্ট একটি ঐশী বিধানের মাধ্যমে দুনিয়ার বুকে তাঁরই প্রতিনিধি বা খলীফা হিসেবেই পরিচালিত হতে দেখার বাসনা পোষণ করেন। এই নীতির ব্যতিক্রমই মানুষের জীবনকে দায়-দায়িত্বহীন পথের সন্ধান দেয়। মানুসের জীবন হয়ে পড়ে অবিন্যস্ত এবং এলোমেলো। আর তাই তো দেখি আমাদের ব্যক্তি এবং সমাজ জীবনে অসহায়ত্ব আজ এক সীমাহীন স্তরে উপনীত। কারণ প্রকৃতিসহ মানুষের বিকাশ ও সংরক্ষণের মূল শর্তটির ছেদ ঘটেছে। এ কারণেই বিরাজমান সমাজের অসহায়ত্ব হ্রাস পাওয়ার তুলনায় বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। সর্বশেষে এক অসহনীয় এবং অবাসযোগ্য পারিপার্শ্বিকতা সৃষ্টি হয়ে যাবে, যদি আমরা সচেতন উদ্যোগ নিয়ে 'অসহায়ত্বের' সংগে 'দায়িত্বের' সংযোগ ঘটাতে সক্ষম না হই। প্রকৃতির বিকাশ এবং সংরক্ষণের এই সাধারণ অথচ মুখ্য শর্তটি ভঙ্গ করে আমরা নিজেদের জন্য ধ্বংসের পথই কেবল রচনা করতে যাচ্ছি।

এ পথ বন্ধ করে দেয়ার উপায় একটিই কেবল এবং তা হচ্ছে- আল্লাহ প্রেরিত বিধান আল-কোরআন নির্দেশিত জীবনধারা অনুযায়ী মানব জীবনের পুনর্বিন্যাস ঘটানো। সেই পুনর্বিন্যাসই মানুষকে বর্তমান অধঃপতিত স্তর থেকে শ্রেষ্ঠত্বের স্তরে পৌছে দেবে এবং মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব কেন হল সে প্রশ্নটি মনকে আর আলোড়িত করবে না তখন। প্রসঙ্গক্রমে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে, আল্লাহ তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বপ্রিয় বান্দা আমাদেরই প্রিয়তম নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-কে যেহেতু মানুষের আকৃতি এবং গুণাবলী দিয়েই সৃষ্টি করেছেন, সেহেতু মানুষকে আল্লাহ সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে ঘোষণা করে তাঁর রসূলের প্রতি 'রহমত' বর্ষণ করেছেন।

সৃষ্টির সেই 'রহমত' মানুষ তার আপন কার্যকলাপ দিয়ে সৃষ্টি-ধ্বংসেরই কারণ হয়ে দাঁড়াক, তা আল্লাহ বা তাঁর প্রিয়তম রসূল (সঃ)-এর কাম্য নয়। আল্লাহ প্রদত্ত 'দায়িত্ববোধশক্তি'র পূর্ণ বিকাশ এবং প্রয়োগের মধ্য দিয়ে মানুষ স্রষ্টার সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে স্রষ্টার নৈকট্য লাভের প্রয়াসে অগ্রসর হতে থাকুক এটাই স্রষ্টার বাসনা। তাই সর্বক্ষেত্রে 'দায়িত্ববোধশক্তি'র সচেতন ব্যবহারই মানুষকে সংকটমুক্ত রাখবে এবং স্রষ্টার নৈকট্য লাভে সক্ষম করে তুলবে।

www.pathagar.com

www.pathagar.com